যুব আনন্দের বড়দিন

লিটন ইসাহাক আরিন্দা

যিশুর জন্মদিন, আনন্দময় বড়দিন উৎসব আমাদের কাছে উপস্থিত। ঈশ্বর অনুগ্রহ করে ভালোবাসা হয়ে ধরা দিয়েছেন জগতে। আনন্দে মাতোয়ারা সমগ্র জগৎ। যিশুর জন্ম মানবজাতির জন্য সঞ্চিত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। রাখালেরা আনন্দ সংবাদ পেল; "ভয় পেয়োনা! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত জাতির মানুষের জন্যই সঞ্চিত হয়ে আছেচ" *(লুক ২:১০)*। যিশু মানবজাতির জন্য শান্তি নিয়ে এসেছেন। আর তাঁকে ঘিরেই সবার আনন্দ। "জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক ২:১৪)*। ঈশ্বর পুত্র যিশু ঈশ্বরের ভালোবাসার মহান প্রমাণ। বড়দিন, যিশুর জন্মদিন, তাঁকে ঘিরেই আমাদের আনন্দোৎসব। তিনি তাঁর ভালোবাসায় গোটা পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়ে হতাশা নিরাশার অন্ধকার দূর করে আলোর পথে চলতে আমাদের কাছে এসেছেন। যুব জীবনের অসম প্রতিযোগিতা, হতাশা নিরাশা ও না পাওয়ার আক্ষেপ মাঝে বড়দিন আনন্দ ও শান্তি। আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও শক্তি।

যুব আনন্দে বড়দিন

বড়দিন উৎসবকে প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করে তুলতে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক প্রস্তুতি এবং উৎসবমূখর করতে যুবারা খুবই চেষ্টা করে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রাণচঞ্চল পদচারণায় মূখর পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লীর আঙ্গিনা। যুব সমাজের উৎফুল্লতা ও প্রাণবন্ত আয়োজন বড়দিনকে উৎসবমূখর করে তোলে।

বড়দিন উৎসব ও যুবাদের প্রস্তুতি

বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে যুবারা বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে।

ক) আধ্যাত্মিক: বড়দিন উৎসবকে অর্থপূর্ণ করতে যুবারা আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের যেমন প্রস্তুত করে, তেমনি অন্যদের প্রস্তুতিতেও সাহায্য করে। আগমনকালীন প্রোগ্রাম (গ্রাম ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে) পাপস্বীকার ও খ্রিস্টযাগ, আগমনকালীন ধ্যানসভা ও সেমিনারের আয়োজন করে নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করে। উপাসনায় যুবাদের সক্রিয় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

খ) বাহ্যিক প্রস্তুতি: বাহ্যিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণে যুবারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নিজেদের বাড়ি, গ্রাম ও ধর্মপল্লী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যুবারাই করে। তাদের সৃজনশীল সাজে সজ্জিত হয় বাড়ি ও গির্জাগুলো। এই কাজে যুবাদের সহভাগিতা, সহযোগিতা ও সৃজনশীলতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যুবারা নিজের বাড়ি ও সহপাঠী বন্ধুদের কাজেও সাহায্যে এগিয়ে আসে। যুবারা তাদের সংঘ ও সংগঠনের মাধ্যমে বাহ্যিক প্রস্তুতিতে বড়দিন উৎসবকে করে তোলে আনন্দমূখর।

যুব কার্যক্রমে আনন্দের বড়দিন: বড়দিন উৎসবকে আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ করতে যুবারা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে। যুবাদের আয়োজন ও অংশগ্রহণে নগর কীর্তনের মাধ্যমে সকল ধর্মের মানুষের কাছে যিশুর জন্মের আনন্দবার্তা প্রচার করে। বড়দিন উপলক্ষে ম্যাগাজিন, ক্যালেণ্ডার ও বিভিন্ন ব্যানার পোষ্টার তৈরী করে ও প্রকাশ করে। বিভিন্ন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা। এখনও গ্রামাঞ্চলে বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামে/পাড়ায়/ধর্মপল্লীতে প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। এই আনন্দ ভোজ আয়োজনে যুবারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। "সবসময় প্রভুতে আনন্দ কর, আমি আবার বলছি আনন্দ কর" *(ফিলিপ্পীয় ৪:৪)*। যুব সমাজের সক্রিয় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ প্রতিটি অনুষ্ঠানকে করে তোলে আনন্দপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ। জীবনের তারণ্যের এই সময়ে যুবারা, পরিবার, সমাজ তথা মণ্ডলীতে একত্রিত হয়ে উৎসব করতে যেমন সহায়ক করে তেমনি উপস্থিত থেকে করে তুলে প্রাণবন্ত। যুবারা তাদের সক্রিয় কার্যক্রম দিয়ে সকলের কাছে আনন্দবার্তা নিয়ে যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুবাদের আনন্দ ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্বর্গদূতদের জয়গান সবার কাছে নিয়ে যায়। "জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বোলোকের জয় অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক: ২:১৪)*। যিশুর আদর্শকে অনুসরণ করে যুবারা দীনদুঃখী সবার কাছে বড়দিনের আনন্দ বয়ে নিয়ে যায়। এভাবেই যুবারা যিশুর সুসমাচার প্রচার করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ও যুব সমাজ: যুবারা পরিবার সমাজ ও মণ্ডলীর প্রাণ। তারাই ভবিষ্যৎ পরিবার ও মণ্ডলীর পরিচালক ও নেতৃত্বদানকারী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুবারা অনেক কিছুর সাথে জড়িত থাকলেও কিছু যুবারা বিশ্ব সমাজের নিত্য নতুন আবিষ্কার, অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও যুদ্ধের কারণে অনেক যুবারা জীবন হারিয়েছে, অভিবাসী ও বাস্তুহারা হয়েছে। পড়াশোনা (ভর্তি প্রতিযোগিতার, পরীক্ষা ও সেশন জট) ও চাকুরির কারণেও অনেকে পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে দুরে আছে। এইসব কারণে অনেক যুবারা মনোকষ্ট ও হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। ফলে অনেক যুবারা সত্যিই মনোকষ্ট অর্থকষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণার স্বীকার হচ্ছে। অনেক যুবারা রাজনীতি ও সমাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিযোগিতার স্বীকার হচ্ছে। জীবন পথে চলার এই অবস্থাকে মেনে যুবারা চায় এগিয়ে যেতে ও আনন্দে অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে। যুবাদের এগিয়ে যাওয়া ও অংশগ্রহণ সত্যিই পরিবার ও সমাজের জন্য আশার চিহ্ন সুসংবাদ। অবহেলিত রাখালদের কাছে যেমন স্বর্গের দুতেরা সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন; "ভয় নেই, আমি তোমাদের কাছে এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ, সকলের জন্য মহা আনন্দের সংবাদ। আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন। তিনি খ্রিস্ট প্রভু" *(লুক ২:১০-১১)*। যুবারাও তাদের সমস্ত হতাশা নিরাশা ও মনোকষ্ট ভুলে গিয়ে পরিবার ও সমাজে বড়দিনের আনন্দ প্রকাশ ও প্রচার করে। তাদের এই অংশগ্রহণ সমাজের আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। বড়দিন হয়ে ওঠে আনন্দময় উৎসব।

উপসংহার: যুবাদের তারণ্য ও সক্রিয় উপস্থিতি পরিবার ও সমাজের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ পায়। জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতার মাঝেও বড়দিন উৎসব ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। ত্রাণকর্তা যিশু আমাদের জন্য আশার বাণী নিয়ে এসেছেন। বিষাদের সবকিছু ভুলে আশা নিয়ে আনন্দে এগিয়ে চলে ধন্য ও সার্থক করি যুব জীবন। জীবন হোক আশা ও ভালোবাসায় পূর্ণ। আমাদের কার্যক্রম দ্বারাই প্রকাশ করি আমরা যিশুর অনুসারী। "তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে প্রমাণ কর যে, তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য" *(যোহন ১৫:৮)*। যিশুর বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন যাপন করে গড়ে তুলি আনন্দপূর্ণ সহভাগিতার মিলন সমাজ। ধন্য করি যুব জীবন যিশুর ভালোবাসায়। এতেই সুন্দর, অর্থপূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে বড়দিন উৎসব॥

মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমিক সংগ্রামী নারীদের অবদান

সিস্টার মেরী কনসোলাটা এসএমআরএ

ভূমিকা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ২৫ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে স্মরণীয় একটি দিন। এই রাতকে বলা হয় কাল রাত্রি। এই দিনে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর হামলা করা হয়। ৭ মার্চ শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা দেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" শেখ মুজিবুর রহমানের এ আহ্বানে বাংলার ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, সর্বস্তরের মানুষ ঝাপিয়ে পড়ে পাক শাসন ও বর্বরতার প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদেরও উজ্জ্বল অংশগ্রহণ ছিল। এ যুদ্ধে নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ ক'রে অর্জন করে স্বাধীনতার মতো একটি অর্জন। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবন বাজি রাখার ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব

প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার প্রয়োজন অনুভূত হলে ও আধুনিক মরণাস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে পেরে ওঠাটা খুব সহজ সাধ্য ছিল না। ওদের সঙ্গে লড়তে হলে যে পরিমাণ প্রশিক্ষিত যোদ্ধা দরকার, সে পরিমাণ যোদ্ধা আমাদের ছিল না, যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র গায়ের জোর ছিল অচল। যোদ্ধার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সারা দেশে এবং দেশের বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সর্বমোট কতটি ছিল সে সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রায় সবগুলোতেই ছিল পুরুষ যুদ্ধার্থীদের জন্য। কোন কোনটি নারী পুরুষ। উভয়ের জন্য এবং খুব কম কেন্দ্রেই ছিল কেবল নারীদের জন্য। প্রশিক্ষক হিসাবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ডা: লাল, ডা: ব্রহ্মচারী, মীরাদেবী, ক্যাপটেন এসএম তারেক, সেবা চৌধুরী, শিপ্রা সরকার। উইমেন্স কো অর্ডিনেটিং কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, যার আওতায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎপর হবার জন্য নারীদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন রেনুকা দেবী এবং সেক্টর ইনচার্স ছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জী। বাংলাদেশের পক্ষে এ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন সাজেদা চৌধুরী। আর প্রশিক্ষক ছিলেন খাতুনদি নামে পরিচিত ডা: লুৎফুন্নেসা খাতুন। কেন্দ্রটি ৪০জন করে একাধিক ব্যাচ নারীদের নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে সুন্দরবনের শরণখোলায় নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোলা নদীর ওপারে এটি ছিল সুন্দরবনের একটি মুক্ত এলাকা, মেজর জিয়াউদ্দিন ছাড়াও এখানে প্রশিক্ষক ছিলেন ভারতীয় আর্মি ক্যাপ্টেন পরিতোষ বাবু। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ব্যাপক হারে নারীগণ প্রশিক্ষণে যোগদান করেছিলেন। নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের সদর দফতর ছিল পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহকুমার টাকিতে। মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এখানে একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

তার নেতৃত্বে এখানে একটি নারীবাহিনী গড়ে ওঠে। বাহিনীর অধিকাংশ নারীই ছিলেন ছাত্রী। এই ক্যাম্পটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রমা। বীথিকা বিশ্বাস এ দলের জন্য নারীযোদ্ধা সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করেছেন ।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ:

সশস্ত্র যোদ্ধা যে নারীও হতে পারেন - এ সত্যটি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মহারাণী, অবন্ড়ীবাঈ লোধী, সদরপুর জমিদার পিয়ারী সুন্দরী, সশস্ত্র বিপবী প্রীতিলতা, তেজীয়ান সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা, টঙ্ক বিদ্রোহী বীরকন্যা রাসমনি হাজং এর উদাহরণ সামনে থাকতেও পুরুষ প্রধান এই সমাজ তা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। নইলে একাত্তরে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে সশস্ত্র যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়েছেন, সাফল্যের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করে তাদের দর্প চূর্ণ করেছেন। যে সব নারী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের কেউ কেউ নিজেদের কথা নিজেরাই কখনো কখনো বলেছেন বটে, কিন্তু সে সব কথাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে না দেশবাসী। সুতরাং এ যাবৎ মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত যে ইতিহাস তা শুধু পুরুষেরই ইতিহাস ।

আসলে নারীরা ব্যাপক হারে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানী পশুশক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নামুক, এতটা চাননি আমাদের দেশের সমর বিশারদ কিংবা উচ্চ পর্যায়ের নেতা নেত্রীরা । সম্ভবত এ কারণেই নারীদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাদের যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে কোন ব্যাপকতর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশ প্রেমিক বাঙালি নারীর সশ্রদ্ধ যোদ্ধা হিসেবে অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করবার ব্যাপকতর সম্ভাবনা নসাৎ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এহেন সীমাবদ্ধতার মাঝেও যেসব নারী শেষ পর্যন্ত অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করবার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাদের প্রথমে পুরুষতান্ত্রিক একটি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে হয়েছে। আর এ জয়মাল্য তারা রণক্ষেত্রেও গলায় ধারণ করে রাখতে পেরেছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ।

আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপক সংখ্যক নারী সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও দেশের আনাচে - কানাচে সংঘটিত যুদ্ধে নারীরা কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেননি, যার সবটা হয়তো আমাদের নজরে আসেনি। দরিদ্র কৃষকের কন্যা তারাবানু যুদ্ধকালে হাবিলদার মুহিবের সংস্পর্শে এসে তারামন নামে পরিচিত হন। হাবিলদার মুহিব তাঁকে ধর্মমেয়ের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর কাছাকাছি রাখতেন। দিনরাত ধর্মপিতার অস্ত্র শস্ত্র নাড়াচাড়া খোলা জোড়া দিতে দিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরযোদ্ধাদের সাহসিকতার বর্ণনা শুনতে শুনতে তারামনের মনে যোদ্ধা হওয়ার প্রেরণার বীজ উপ্ত হয়। তাঁর ভিতর রাইফেল চালনা শিখবার আগ্রহ দানা বাঁধে। হাবিলদার মুহিব তারামনের আগ্রহ দেখে তাকে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেন। তিনি ধর্মপিতার রান্না- বান্নার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রায়ই ডিফেন্স এরিয়ার গেরিলা যুদ্ধগুলোয় স্বশরীরে উপস্থিত হতে শুরু করেন।

এখানে কাঁকন বিবির বীরত্বের কথাও প্রণিধানযোগ্য। কাঁকন বিবির পাঞ্জাবি স্বামী তাঁকে নিরন্ন অবস্থায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার থানায় অবস্থিত বোগরা ক্যাম্পে ফেলে রেখে সহযোগিদের নিয়ে সিলেট চলে যায়। তার স্বামীকে না পেয়ে ভিখারিণী সেজে মুক্তিবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ কাজ করতে বেরোন কাঁকন বিবি। কিন্তু তাঁকে দিয়ে পাঞ্জাবিদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যোগ দেন মুক্তিবাহিনীর দলে। শুরু হয় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কাঁকন বিবির ভয়ানক অভিযান। আগস্ট মাসে পাকিস্তানিরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করলে তাদের পথ রোধ করতে গভীর রাতে জর্জিয়া ব্রিজ ধ্বংস করার

কাজে সহযোগিতা করেন কাঁকন বিবি। মাইন বিস্ফোরণে এই ব্রিজ ধ্বংসের বড় কৃতিত্ব কাঁকন বিবির। এই ভাবে সাহসী নারীরা পুরুষদের সাথে সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্বে নারীগণ

যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অল্প সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করলেও পরোক্ষভাবে দেশের সকল নারী বা মায়েরা স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার আশায় যুদ্ধ করেছেন, কেউ বা পুত্র বা স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দান করেছেন। কেউ বা আবার নার্সিং সেবায় অহত বা মৃত্যু পথযাত্রী ভাইকে সেবাদান করেছেন। কেউ বা আবার ক্ষুধার্ত ভাইকে খাদ্য ও জল দিয়ে তৃপ্ত করেছেন । কেউ আবার ভিক্ষুক সেজে মুক্তি ভাইদের জন্য বিভিন্ন তথ্য বা বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র এনে দিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহ এবং আদান-প্রদানের কাজে নারীরা পুরুষের চেয়েও অধিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। সারাদেশে এরকম বার্তাবাহক নারীর সংখ্যা অসংখ্য। কেউ বা নিজের গৃহে থেকে, ভিখারিণী সেজে, ফেরিওয়ালিনী সেজে, বা পাগলি সেজে সংবাদ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ও ভারতের সীমান্ত এলাকায় নারীরা নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসবের অধিকাংশই আয়োজিত হয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্যোগে। কিন্তু কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই সারাদেশে আরো অজস্র নারী সেবাকাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নারীদের একটা বড় গুণ সেবাপরায়ণ মানসিকতার অধিকারী হওয়া। যুদ্ধাবস্থায় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোটা দেশটাই হয়ে উঠেছিল আনুষ্ঠানিক হাসপাতাল আর শত শত মহিয়সী নারী হয়ে উঠেছিল সেসব হাসপাতালের চিকিৎসক কিংবা সেবিকা, আত্মার আত্মীয়। এছাড়াও সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিকিৎসক বোনদের মধ্যে যে যেখানে কর্মরত ছিলেন, সেখানেই তাঁরা যোদ্ধাদের প্রতি হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। এঁদের এই তৎপরতা কত যে ঋণ রক্ষা করেছে, তার কোন সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য আজ ।

ধনী পরিবারের নারীদের মতোই দরিদ্র পরিবারের নারীও ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের সন্তানের মতো যত্নে খাইয়ে, আশ্রয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সারাদেশের অসংখ্য পরিবার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ না করলে আমাদের যোদ্ধাদের দ্বারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করা সম্ভব হত না।

লাঞ্ছিত নারীদের করুণ কাহিনী:

মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাস সারা পূর্ববঙ্গে ১৪ লাখ বাঙালি নারীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও স্বজনহারা অবস্থায় নিঃস্ব হতে হয়েছে। এই ১৪ লাখ নারী বর্বর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর বাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং বিহারিগণ কর্তৃক বলাৎকারের শিকার হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ পরে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সংখ্যার এই আধিক্য প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একাত্তরের স্বাধীনতা আনায়নে বাঙালি নারীকে কী চরম বীভৎসতার শিকার হতে হয়েছে। কোন মিনারেই এই নির্যাতিতদের নাম খোদাই করে রাখা হয়নি এঁদের কী ভয়ানক পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় নির্যাতিত নারীদের চিকিসাসেবা দানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আগত শল্য চিকিৎসক জিওফ্রে ডেভিসের মন্তব্য থেকে। তাঁর মতে, নয় মাসে পাকবাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা ৪ লাখ মহিলার বেশির ভাগই সিফিলিস অথবা গনোরিয়া কিংবা উভয় ধরনের রোগের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে ভ্রূণহত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এরা বন্ধা হয়ে যেতে পারেন কিংবা বাকি জীবনভর বারবার রোগে ভুগতে পারেন। তিনি জানান বাংলাদেশে কোন সাহায্য এসে পৌঁছার আগেই পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের ফলে ২ লাখ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ স্থানীয় গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্য গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। ডাঃ জিওফ্রে ডেভিস চিকিৎসা সেবাদানের জন্য বাংলাদেশে আসতে আসতে অধিকাংশ মহিলা ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচী শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার অন্তঃসত্ত্বা মহিলা নানা স্থানীয় উপায়ে গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউবা তাদের শিশুরে নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে অধিকাংশেরই। এই যুদ্ধশিশুদের একটা বড় অংশ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পরিবারে দত্তক হিসেবে রয়েছে, যাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে আর কোন তথ্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। নিঃসন্দেহে ৪ লাখ নারীর বলাৎকারের শিকারে পরিণত হওয়া আমাদের জন্য অতীব কষ্টদায়ক ঘটনা।

ভোগোম্মুত্ত খানসেনারা নারীর প্রয়োজনে সর্বদা তাদের দোসরদের ওপরই নির্ভরশীল থাকেনি। প্রায় এরা নিজেরাই স্কুল কলেজে হামলা দিয়ে ট্রাক ভরে নিয়ে এসেছে নিষ্পাপ কিশোরীদের। তারপর তুমুল আনন্দে হৈ চৈ-এর ভিতর দিয়ে বাপের সামনে মেয়েকে, ছেলের সামনে মাকে বলাৎকার করে এরা স্থাপন করেছে হীন মনোবৃত্তির নিকৃষ্ট পরিচয়। রমজান মাসে রোজাদার নারীদেরকেও এরা ছাড় দেয়ার।

বলাৎকারের সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা ঘটেছে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। নিত্যই এখানে ধৃত হয়ে এসে নির্মম ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে অজস্র কিশোরী-যুবতীকে। প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এখানে যাদের ধরে আনা হত, তাদের অনেকের হাতেই থাকত বই, খাতাপত্র। অর্থাৎ এরা ছিল স্কুল বা কলেজের ছাত্রী। হয়তো রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতার মধ্যেও ওরা পড়াশুনাটা নষ্ট করে ঘরে বসে থাকতে চায়নি। চেয়েছ নিজেদের ব্রতে নিজেরা নিয়োজিত থাকতে। অথচ আকস্মিক আক্রমণে তাদের সদলে ধরে নিয়ে গিয়ে বরাবর তাদের ব্রতের থালায় ঢেলে দিয়েছে এঁটোকাটা। কখনো কখনো কোন মহিলা ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গৃহবধূ ও কিশোর- যুবতীদেরও এখানে উঠিয়ে আনা হত । ভয়ে বিহ্বল, আতঙ্কগ্রস্ত এসব মেয়েদের নিয়ে যখন ট্রাক এসে পৌঁছতো পুলিশ লাইনের ভিতরে, তখন সৈন্যদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যেত। ট্রাক থেকেই তারা পছন্দমতো মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে নামাত । প্রকাশ্যে তাঁদের গায়েরে পরনের পোশাক খুলে ফেলত। সর্বসমক্ষে কিংবা গাছ বা দেওয়ালের একটু আড়ালে নিয়ে লিপ্ত হত বলাৎকারে । প্রথমদিন যথেচ্ছা ব্যবহারের এসব মেয়েকে হেড কোয়ার্টারের চতুর্থ তলায় নিয়ে রাখা হত সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থা, যাতে কেউ কাপড় পেচিয়ে আত্মহত্যা করতে না পারে। সেখানে তাঁদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে চুল দিয়ে রডের সাথে বেঁধে রাখা হত। রাতের বেলায় পুনরায় শুরু হত পৈশাচিকতা। কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলেও রেহাই মিলত না। যারা প্রতিবাদ করত তাঁদের জন্য রোমহর্ষক সাজার ব্যবস্থা হত। কাউকে-বা উলঙ্গ অবস্থায় পা ওপরে বেধে ঝুলিয়ে রাখা হতো, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কারো বা কেটে নেওয়া হত স্তন, কারো বা যোনিপথে ঢুকিয়ে রাখা হত রাইফেলের বাট। প্রতিনিয়ত এঁরা আর্ত চিৎকার করত, কিন্তু পুলিশ লাইনে অভ্যন্তরে থাকা বাঙালি সিপাহিদের এসব আর্তনাদ দারুণভাবে স্পর্শ করলেও তাঁদের কিছুই করার থাকত না। কারণ তাঁরা নিজেরাও প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুণতো ।

নারী পুরুষের বৈষম্য মুক্তিসংগ্রামে

নয় মাসের যুদ্ধে অনেক নরনারীই নিজের জীবন আর মান বাজি রেখে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার আশায় কিন্তু তাদের সেই আশা পূরণ হওয়ার আগেই তাদের অনেককে চিরতরে বিদায় নিতে হয়েছিল এই বাংলার মাটি থেকে। যুদ্ধের এই সময়টাতে মনে হয়েছে দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করবার জন্য নারী ও পুরুষ এক

কাতারে লড়াই করতে পারে, যুদ্ধ করতে পারে। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছিল নারীরা। যুদ্ধ শেষে ঘরে ফেরার পালা। স্বীকৃতি দেওয়ার সময় নারীরা পেল না মর্যাদা, লেখা হল না তাদের বীরত্বগাঁথা। মুছে গেল হাজারো, লাখো জীবনের ইতিহাস। অপর পক্ষে পুরুষদের বীরোত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি কত উপাধিতে ভূষিত করা হল। তাদের নামে কত রাস্তা তোরণ শহীদ মিনার স্মৃতিসৌধ করা হল। তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় খোদাই করে লেখা হল।

মুক্তিযুদ্ধের কারণে যারা ধর্ষিত হয়েছিলেন, সদ্বিবেচনায় তারাও মুক্তিযুদ্ধে আহত বা নির্যাতিত হয়েছেন, বলা যায় তারাও মুক্তিযোদ্ধা খেতাব পাবার যোগ্য। কিন্তু বীরাঙ্গানা খেতাব দিয়ে এদেরকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। বিশাল সমাবেশে এই দুটি স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটার নেপথ্যে বেশকিছু ঘটনা কাজ করেছে। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর ক্ষেত্রে কাজ করেছে তার আত্ম প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও পারিবারিক স্বীকৃতি নূরজাহান বেগম স্বকর্মে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর মতো খ্যাতিমান নন, কিন্তু বীরাঙ্গনা হবার কারণে তিনি স্বাধীনতা উত্তরকালে অন্য অনেকের মত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর পরিবারের নিষ্ঠুরতার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার নূরজাহান বেগম দায়ে পড়ে হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল। তার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ বীরাঙ্গনার জীবন বাস্তবতাই চরম দারিদ্র্যকে ছুঁয়ে আছে। বদ্ধমূল পুরুষতান্ত্রিক মনমানসিকতার কারণে নারীরা ব্যাপকভাবে গণহত্যার শিকার হলেও শহীদের তালিকায় পুরুষদের মতো তাদের নাম অন্তর্ভূক্ত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের সমাজ কখনোই গ্রহণ করতে চায়নি। পিতা বা ভাই গ্রহণ করতে চায়না তাদের ধর্ষিতা মেয়ে বা বোনকে। স্বামী গ্রহণ করতে চায় না তার স্ত্রীকে। প্রেমিক গ্রহণ করতে চায় না তার প্রেমিকাকে। ফলে ধর্ষিতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এবং আত্মহত্যাকে বরণ করে নেন। অনেকে আবার নানা রকম রোগ ব্যাধি এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে নেন। তাদের গর্ভজাত অনেক সন্তান অবাঞ্চিত সন্তান হয়ে আছে।

উপসংহার

মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা প্রিয় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার অদম্য ইচ্ছা কার না থাকে। দেশ স্বাধীন হবার পর ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নারীদের স্বপ্ন ছিল একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত স্বাধীন দেশ দেখার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধ, যে যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সকল শ্রেণীর বেসামরিক লোকজন বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। এর একটি অংশ ছিল দেশ প্রেমিক বীর নারীরা। শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে লেখাপড়া না জানা নিম্নবিত্তের নারীদের অবদানও ছিল। এমন অনেক নারী মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিলেন, যাদের অনেকের পরিবার কেউ কেউ যুদ্ধে লিপ্ত, আহত বা শহীদ হয়েছেন।

সভ্যতার সকল অর্জন নারী পুরুষের মিলিত কর্মের ফল। বাঙালি জাতীর মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অধ্যায় রচনায় নারী পুরুষ উভয়েরই অবদান স্বীকার্য। এ বিশ্বাসে যতদিন পর্যন্ত আমরা স্থির হতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত আমরা পিছিয়ে পড়া, খন্ডিত ও পক্ষপাতপূর্ণ চিন্তা চেতনায়ই গ্রহণ করতে থাকবো। আশা করি অচিরেই আমরা নারী পুরুষের বৈষম্যকে দূর করে সচেতনতা লাভ করবো এবং প্রত্যেকে যার যার মর্যাদা দিয়ে উন্নত মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারবো॥ ৩

তথ্যসূত্র :

নারী জীবনের গল্প

নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন॥

YWCA নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নাম : সাধারণ সম্পাদক (জেনারেল সেক্রেটারি)

পদ সংখ্যা: ১ জন (নারী প্রার্থী)। অবশ্যই কোন স্বীকৃত খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।

কর্মস্থল : চট্টগ্রাম ওয়াইডাব্লিউসিএ, চট্টগ্রাম

দায়-দায়িত্ব সমূহ:

স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর সার্বিক পরিচালনা ও দায়িত্ব পালন; অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর জন্য পরিমাপযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত, অর্জন যোগ্য বাজেট প্রনয়ন এবং বাজেট অনুসারে কর্ম সম্পাদন; স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়াদির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন; চলমান কর্মসূচী সহজ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত সকল কর্মসূচী পরিদর্শন ও মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান; নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সকল দাতা সংস্থার সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ; স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ কার্যকারীভাবে ব্যবহার; ন্যাশনাল এবং স্থানীয় বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সাথে সমন্বয় সাধন, যোগাযোগ, সভা আহ্বান, মিটিং মিনিটস্ প্রস্তুতসহ এক্স অফিসিও হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন; বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করে যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ; সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন ফোরামে ওয়াইডাব্লিউসিএ-র পরিচিতি, যোগাযোগ, প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা; কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত কর্ম এলাকা পরিদর্শন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।

কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে বা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৫-৭ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি লেখা ও বলায় পারদর্শী হতে হবে। কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি: বেতন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী:

প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। সম্পূর্ন আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদি আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ৩/২৩, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) অথবা susmita.hr.ywca@gmail.com এই ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

সাদা কালো জীবন- ৮

মালা রিবেরু

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, গুণবান পতি যদি থাকে তার সনে" এ কথাটির যথার্থ উপলব্ধি মেঘলা তার জীবনে প্রমাণ পেয়েছে। সংসারে সুখ পেতে হলে স্ত্রীর পাশাপাশি স্বামীর সুন্দর মন-মানসিকতার প্রয়োজন তা এ উক্তি থেকে বুঝা যায়। মেঘলা বারবার জীবনে প্রেমে পড়েছে, অনেকবার বিয়ের কথাও ভেবেছে, কিন্তু পরিবারের দায়বদ্ধতা, নিজেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা ও পাশাপাশি চাকুরি করতে গিয়ে সহকর্মীদের পারিবারিক জীবনে কলহ দেখে নিজেকে এই বন্ধন থেকে বরাবর দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু একটা সময়ে যখন নিজের বাবা-মা বোনদের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা ও নিজের পেশাগত জীবনে উন্নতি সাধন হয়েছে, তখন নিজেকে নিয়ে ভাবতে থাকে।

সারাদিন কাজ শেষে ঘরে এসে একাকীত্ব জীবন, পাশাপাশি সমাজের মানুষ, উর্ধ্বতন ও নিম্নশ্রেণি সহকর্মীদের বাঁকাকথা, বাঁকাচাহনি পাশাপাশি অবিবাহিতা সুযোগ নেওয়ার মানসিকতার পুরুষের অভাব নেই। মেঘলা খুব ধার্মিকা, সেই সবকিছু নিরবে সহ্য করতো, আর প্রার্থনা করে মা মারীয়ার কাছে সমস্ত কষ্টের কথা বলতো, মা তুমি তো জানো আমার জীবনের কথা, বলতো আমি আমার বাবা-মা-বোনদের অনেক ভালোবাসি, তাদের জন্য আমার চাওয়া, তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আমার জন্য যা কিছু ভালো তাই তুমি করো।

কথায় আছে "মানুষের কাজ তাড়াতাড়ি, ঈশ্বরের কাজ আস্তে ধীরে" তাইতো এই দুর্বিসহ জীবনের অবসান ঘটতে একদিন বাবার জ্যাঠাতোবোন মানে বাড়ীর এক পিসির ফোন এসে এই কষ্টের জীবনে অবসান ঘটিয়ে দিলো বললো, আমার এক দেবরের সাথে আমি তোকে বিয়ে দিতে চাই, তোর কি মতামত। মেঘলা বললো, আমি চিন্তা করে তোমাকে জানাবো। কিন্তু পরেরদিন ফোনে পিসি বলে, কিছুইতো বলিনা, তোর ফোন নাম্বার কি আমি আমার দেবরকে দিবো। আচ্ছা দাও, মনের অজান্তে বের হয়ে আসলো।

ফোন নাম্বার দেওয়ার পরে বুকের ভেতর কম্পন আর অপেক্ষার সময় গোনা, কখন আসবে সেই অপেক্ষাকিত ফোন, সকাল ১০:৩০ মিনিট আসলো সেই ভরা কণ্ঠের বহুল প্রতিক্ষীত ফোন, কেমন আছেন? ভালো বলতে গিয়ে বুকটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে। একদিন দুইদিন এইভাবে দুইজন কথা বলা বাড়াতে থাকে। মেঘলা তার জীবনের সব কথাই আকাশের সাথে সহভাগিতা করতে চায়, কিন্তু আকাশের একটা কথাই তার চিন্তা ভাবনা পরির্বতন হয়ে যায়। আকাশ যখন বলে "মেঘলা আমি তোমার জীবনে ঘটে যাওয়া ভালো মন্দ কোনকিছুই জানতে বা শুনতে চাইনা। এখন থেকে তুমি আমার, আজ থেকে যেন কোন কিছু না শুনি বা এমন কিছু করোনা যাতে করে আমি কষ্ট পাই। আকাশের সাথে কথা বলার পরে মেঘলা অনেক কেঁদেছে, কষ্টের নয় আনন্দের কান্না। অনেক দেরিতে হলেও একজন ভালো মনের মানুষ সে পেয়েছে, যার ভালোবাসায় সে সামনের দিনগুলো সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

মেঘলা ও আকাশের ৫ বছর অতিক্রম হচ্ছে, এরমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। বাঙালি পরিবারে যা ঘটনা শাশুড়ী বা শ্বশুর পরিবারের অন্যদের সাথে মানিয়ে নিতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু তার স্বামী সব সময় পাশে ছিলো, তার যেন একচুল পরিমাণ অপমান হতে না হয়, সবসময় ছিলো তার সজাগদৃষ্টি। আরেকজন যে তার সুখ-দুঃখের সাথী তার অবদান ভোলার মতো নয়। মেঘলা শ্বশুরবাড়ীর যত দুঃখকষ্ট সবকিছুর শোনার, সর্বদা পাশে আছে ননদিনী। তার আদর ভালোবাসায় সব ভুলে যায় মেঘলা।

মেঘলা একসময় খুব ছবি দেখতো। একটি হিন্দি ছবি "হাম দিল দে চুকে সনম" ঐশ্বরিয়া রাই, সালমান খান ও অজয় দেবগনের অভিনয় দেখে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রতি খুব অভিমান হয়েছিলো। মনে মনে খুব রাগ হয়েছে আর ভেবেছে যে, ঐশ্বরিয়া রাই এত স্বার্থপর যে প্রেমিক তাকে এত ভালোবাসতো, তার স্বামী কত ভালো মানুষ। তাকে প্রেমিকের হাতে তুলে দেওয়ার পরেও যাচ্ছে না। কিন্তু আজ নিজের জীবনে চরম সত্য ঘটনা থেকে সে প্রমাণ পেয়েছে ভালো জীবনসঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। পাশাপাশি তার প্রাক্তন অনেক বন্ধুমহল তার সাথে বিয়ের পরে কথা বলতে ও মিশতে চেয়েছে। কিন্তু মেঘলা তার স্বামীর বিশ্বাসের অমর্যাদা কখনোই করেনি, তার শুধু এখন একটাই চাওয়া সারাজীবন সুখে-দুঃখে এই মানুষটার সাথে থাকা॥

শীতের আমেজ

স্বপন বৈরাগী

ঘাসের উপর শিশির ভিজা,
রুপালী প্রলেপ দেশ
খেঁজুর গাছের রসের ফোঁটা ঝরছে ভাল বেশ
গাছিভাই গাছ কেটেছে, খিল বসিয়েছে গাছে
সবজি চাষের হিড়িক পড়েছে ব্যস্ত সবে মাঠে।

সূর্য্য মামা জাগার আগে জাগছে মোদের চাষি
আখ, অড়হল, শষ্যের ফুলে তাদের মুখে হাসি-
শিম, বরবটি, পিঁয়াজ, রসুন চাষ করছে ভাল
সবজি ক্ষেতে পোকার উৎপাতে
মনটা ভেঙ্গে গেল।

শষ্যা ফুলে বাসন্তি রঙ্গে সাজছে গ্রাম দেশ
পৌষ পাবনের পিঠা পায়েসের
ধুম পড়েছে বেশ
নতুন বধু চলছে দেখ আকাঁ বাকাঁ পথ ধরে
মাঝিমাল্লা নাও বাইছে, ভাটা নদীর তীরে।
তাই তোমার আশিষে তৃপ্ত মোরা,
শিশিরভেজা কুয়াশার ধারা
মিষ্টি হাওয়ার শ্রেষ্ঠরাজা
সৃষ্টিরাজের আমরা প্রজা।

ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র একজন মিউরেল গমেজ এর কথা

প্রতিটি সফলতার নেপথ্য থাকে কষ্ট, অধ্যবসায়, ধৈর্য, থাকে অনেকের সমর্থন। সফল ব্যক্তি বাধাকে এড়িয়ে যান না, বরং তাকে জয় করে এগিয়ে যান সম্মুখপানে। আমাদের সমাজে নারীরা এখন আর স্থবির নয় কিংবা পিছিয়ে নেই। তারা আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে বিজয়নিশান উড়িয়ে অবস্থান করছে পুরুষের পাশে। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো যিনি কঠোর পরিশ্রম ও মেধাকে ব্যবহার করে হয়ে উঠেছেন দেশ ও খ্রিস্টান সমাজের গর্ব।

বাঙালির নারী সমাজের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন মিউরেল গমেজ। আঠারো গ্রামের বড়গোল্লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রয়াত ডমিঙ্গো গমেজ ও মাতা প্রয়াত নিম্ফা গমেজ। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (Green Herald International School, Holy Cross College, Summerfield International school) ক্রীড়া শিক্ষিকা এবং কোচ হিসেবে কর্মরত আছেন। একজন মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে তার অসামান্য অর্জনের জন্য তিনি (অ্যাথলেটিক্স বিভাগ) থেকে জতীয় ক্রীড়া পুরুস্কারে ভূষিত হন যা তার হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রির ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে মে ১১, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। ক্রীড়া আঙ্গিনায় মিউরেল গমেজের সফলতায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তার সাথে আলাপনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পিটার ডেভিড পালমা ও শুভ পাস্কাল পেরেরা।

১। আপনার শিশু-কিশোর কালের কথা বলুন?

আমি ছোটবেলা থেকে ডানপিঠে ছিলাম। ছেলেদের সাথে ফুটবল, দাঁড়িয়াবান্ধা বাড়ির পাশের নদীতে কাটা নৌকা বাওয়া ইত্যাদি করতাম। ছোট বেলা থেকেই আমার খেলাধুলার প্রতি দারুণ একটা নেশা ছিল। দাঁড়িয়া বান্ধা, হাডুডু, নদীর ঘাটে স্লিপারের খেলা, ডাইভ দেওয়া সহ নানা খেলাধুলায় মেতে থেকেছি। স্কুল জীবনে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। খেলার প্রতি আমার এমন দারুণ নেশা দেখে আমার প্রধান শিক্ষিকা মাদার এলিজিয়া আমাকে নিয়ে আসেন ঢাকায়।

২। খেলাধূলার সাথে জড়িয়ে যাওয়ার গল্পটা কেমন ছিল?

বলতে গেলে মাদার এলিজিয়ার হাত ধরে আমার ক্রীড়া জগতে প্রবেশ। আর মাদারের জন্যই আমি আজকে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। সেন্ট থেক্লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি পাশ করার পরে তিনি আমাকে মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজে ভর্তি করে দেন এবং এখান থেকেই আমার জীবনের এই খেলোয়ার জীবনের গল্পের শুরু। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় থানা পর্যায় ১০০/২০০ মিটার, উচ্চ লম্ফে এবং গোলক নিক্ষেপে প্রথম স্থান অধিকার করি। তারপর জেলা এবং বিভাগিয় পর্যায়ে আমি ১০০/২০০ মিটার উচ্চ লম্ফে এবং গোলক নিক্ষেপে প্রথম স্থান অধিকার করি। (আদমজী জুটমিল) 'বি জে এম সি' তে চাকুরিতে অংশগ্রহণ করে হ্যান্ডবল, ভলিবল, কাবাডি, হকি, বাস্কেটবল, ফুটবল খেলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় গোল্ড মেডেল অর্জন করি। ১৯৭৮ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাধুলার ফলাফলের ওপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি ১১ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে গোল্ড মেডেল অর্জন করি।

৩। খেলাধূলা ও পড়াশুনার মধ্যে সমন্বয় ব্যাপারে কি বলেন?

খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে এবং লেখাপড়া মানুষকে উন্নত করে। লেখাপড়ার কোন বিকল্প নেই কারণ চাকুরি করতে হলে ডিগ্রি দরকার এবং যে দেশ যত শিক্ষিত সে দেশ ততবেশি উন্নত।

৪। ক্রীড়া জগতে ক্যারিয়ার কেমন?

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ অলিম্পিক এবং ২০০৩ পর্যন্ত আমি দৌড় ২০০ মিটারে ও উচ্চ লম্ফ ২০০ মিটারে আমি গোল্ড মেডেল পাই এবং হ্যান্ডবল, ভলিবল, কাবাডি, হকি, বাস্কেটবল ও ফুটবলে গোল্ড মেডেল সহ জাতীয় পদক পেয়েছি।

৫। বাংলাদেশে নারীদের প্রতিষ্ঠিত ক্যারিয়ার গড়তে আপনার পরামর্শ কি?

পিছনে লোকে কিছু বলে সব কিছু বাদ দিয়ে আমি প্রতিটি মেয়েকে বলবো উঠে-পড়ে লেগে থাক, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। পারবো না বললে হবে না ও নিজের ওপর হাল না ছেড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নারী, খেলাধূলা, পড়াশুনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। তাই আমি বলবো প্রতিটা নারীকে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে।

৬। একজন খ্রিস্টান হিসেবে খেলাধূলার মাধ্যমে কিভাবে বাণীপ্রচার করেছেন?

আমি যখনি খেলার মাঠে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম তখন আমি ক্রুশের চিহ্ন করে খেলা শুরু করতাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার ন্যায়নিষ্ঠার, নম্রতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং আমার আচার ব্যবহারের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের নাম প্রচার করতাম। আমার পুরো জীবনটা খেলার মাঠে উৎসর্গ করেছি ঈশ্বরের নামে।

৭। নারীদের এগিয়ে চলতে কি কি ধরনের বাধা আসতে পারে ও তা দূরীকরণে পদক্ষেপ কেমন হতে পারে?

গ্রামের মানুষ আগে বলতো খেলাধুলা করলে মেয়ে কালো হয়ে যাবে, বিয়ে হবে না। খেলাধুলাকে অনেকেই ভালো মনে করতো না, ভালো সুনজরে দেখত না ও পছন্দ করতো না। তাই অনেক মেয়েরা ভয়ে খেলাধুলাই অংশগ্রহণ করতো না। তাই আমি মনে করি প্রতিটি মেয়েকে বাধা অতিক্রম করে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করতে হবে। এই ব্যাপারে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তাদের সন্তানদের অবশ্যই সুযোগ করে দিবেন।

৮। যুব সমাজের উদ্দেশে আপনার বক্তব্য কি?

আমি মনে করি যে আমাদের যুবাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তোমরা পারবে তোমাদের জীবনের প্রতিভা গড়ে তুলতে এবং আমাদের খ্রিস্টান সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং পারবোনা, হবেনা বলা যাবে না। বর্তমানে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে তার ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং দেশ ও খ্রিস্টান সমাজের উন্নত ঘটাতে হবে।

আমাদের খ্রিস্টান সমাজে যেন এমন আরও অনেক মিউরেল গমেজের জন্ম হয়। তার জন্য আমাদের সকলের উচিত মেয়েদের প্রতি যত্ন নেওয়া ও তাদের যথোপযুক্ত সুযোগ দান করা। সবশেষে আবারও মিউরেল গমেজকে অনেক অভিনন্দন জানাই তার এই অসাধারণ কীর্তির জন্য এবং তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য॥

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ

শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন

সমবায়ীদের প্রথম ও স্বল্পের হাসপাতাল

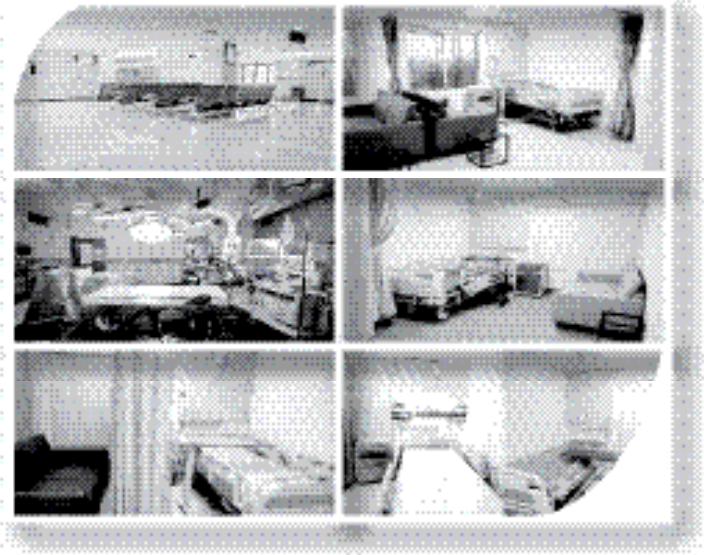

যে সকল সেবাসমূহ থাকবে:

১. জরুরী বিভাগ
২. বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের আউটডোর সেবা
৩. প্যাথলজি
৪. রেডিওলজি ও ইমেজিং
৫. কিডনী চিকিৎসা ও ডায়ালাইসিস
৬. মা ও শিশু বিভাগ
৭. গ্যাস্ট্রোলজি বিভাগ
৮. ফিজিওথেরাপি
৯. টিকাদান সেবা
১০. বিভিন্ন সার্জারী (অপারেশন)
১১. ICU, CCU, NICU, PICU সেবাসমূহ
১২. নাক কান গলা চিকিৎসা সেবা
১৩. দন্ত চিকিৎসা সেবা
১৪. সিঙ্গেল ও ডাবল কেবিন
১৫. নারী ও পুরুষের ওয়ার্ড
১৬. সবুজের আঙ্গিনায় উন্মুক্ত পরিবেশ
১৭. অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সদের আন্তরিক সেবা

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
সিসিসিইউসি:,ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
সিসিসিইউসি:,ঢাকা।

গ্রাম: মঠবাড়ী, ডাকঘর: উলুখোলা, ইউনিয়ন: নাগরী, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

মনোবিজ্ঞানীর চোখে বড়দিন

সিস্টার ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও ও জেমস্ সাইমন দাস

"ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে। কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রিস্টপ্রভু।
- (লুক ২:১০-১১)"

পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতের মাঝেই আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা যিশুর জন্মতিথি উপস্থিত হয়। আমাদের জীবন তখন শীতের ঘাসের ডগার শিশিরেরই মত জ্বল জ্বল করে। আগমনকালের সকল প্রস্তুতির বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই। চারিদিকে যিশুর জন্মতিথি উপলক্ষে কীর্তন, পিঠাপুলি, খাওয়া-দাওয়া, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, নানা ধরনের কর্মসূচীতে ব্যস্ত সময় পার হয়। জাগতিকভাবে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলে আমরা যেমন পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন খুশি হই, আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করি, একসঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিই তেমনি যিশু খ্রিস্টের জন্ম তিথিতেও আমরা একই কাজগুলো করি। বড়দিনের সময়টিতে সত্যিই মনে হয় যেন আমাদের পরিবারে নতুনভাবে শিশু যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন আমরা যেন ফিলিপীয় মণ্ডলীতে সাধু পৌলের লেখা পত্রের বাস্তবায়ন দেখি "তোমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর, পুনরায় বলিব আনন্দ কর *(ফিলিপীয় ৪: ৪)*।" তখন সকল কিছুর মধ্যেই যেমন: উপহার দেওয়া, দান করা, মানুষকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো, কীর্তন করা ইত্যাদিতে আমরা আনন্দ খুঁজে পাই। আমাদের সকল আনন্দের মূল কেন্দ্রবিন্দু চিরন্তন শান্তিরাজের আমাদের জীবনে আগমন। আমাদের আধ্যাত্মিক রাজাকে স্বাগত জানাতে জাগতিক জীবনে আনন্দের ও শান্তির নানা রীতি-নীতি পালন করি। এ সময় প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, পবিত্র বাইবেল থেকে সহভাগিতা, রোজারি প্রার্থনা, আমাদের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আরো কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি। আমরা ঈশ্বরকে নতুনভাবে গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা লাভ করি। তবে বড়দিনে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর সাথে পালিত রীতি-নীতিগুলো কতটুকু আমাদের জন্য উপকারি আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায়? বড়দিনে কি পরিবারের আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই একসাথে মিলিত হতে হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দিতে পারেন। তবে পেশাদার মনোবিজ্ঞানী বড়দিন উদ্‌যাপন ও এর সাথে সম্পৃক্ত রীতি-নীতি কীভাবে আপনার আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে দৃষ্টিকোণ থেকে এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

বড়দিন পালনে কতকগুলো ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি প্রচলিত আছে। এসব রীতি পালনের ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। যেমন ধরুন, বড়দিন পালন করতে গিয়ে আমরা পরিবারের সবাই একসাথে মিলিত হই। বড়দিনের দিন সবাই মিলে একসাথে গির্জায় যাই। সবাই একসাথে বসা, গান করা, দাঁড়ানো, উপাসনা শুরু ও শেষের পর একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, কীর্তন ও বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি আমাদের মধ্যে পারস্পরিক টানবোধ তৈরি করে। একজন ব্যক্তি তখন অনুভব করেন 'আমি একা নই, আমি বড় একটি দল বা গোষ্ঠীর একজন সদস্য'। এভাবে সম্মিলিত হয়ে রীতি পালন আমাদের মধ্যে 'সমষ্টিগত প্রফুল্লতা' বা 'Collective Effervescence' আনয়ন করে এবং বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসেবে সকলের সাথে টান বা ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করেন।

বড়দিনের সময় বাড়ি-ঘর ও গির্জা সাজানোর রীতি বহু পুরানো। আমি দেখেছি, উত্তরবঙ্গের আদিবাসি খ্রিস্টান ভাই-বোনগণ বড়দিন এলেই গির্জা ও নিজেদের মাটির ঘর-বাড়িগুলো লাল মাটি ও রং দিয়ে আল্পনা দিয়ে রাঙিয়ে তোলে, কাগজ দিয়ে বিভিন্ন ঝালর, ফুল, ফল ও পাখি দিয়ে গির্জা সাজায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের আদিবাসিদেরকে দেখেছি গাছ, বাঁশ দিয়ে নতুন করে বাড়ি বানাতে। এছাড়া ঢাকা অঞ্চলের ভাওয়াল ও আঠারোগ্রামের প্যারিসগুলো কি সুন্দরভাবে সেজে ওঠে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিবছর ওয়ার্ড কেন্দ্রিক গির্জাঘর সাজানো এবং বাড়ির উঠানে বিভিন্ন জাতের ফুল, খ্রিস্টমাস্ ট্রি, গোশালা ঘর ও বাড়ি ঘরে আলোকসজ্জা অত্যন্ত চমৎকার। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের একদল মনোবিজ্ঞানী গবেষণায় দেখতে পান যেন বড়দিনের এসব গৃহসজ্জার কাজ আমাদের মধ্যে জীবন নিয়ে সন্তুষ্টি, আবেগীয় সুস্থতা ও সামাজিক ইতিবাচক মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। তাছাড়া গৃহসজ্জার এসব কাজ একাকীত্বকে দূরীভূত করে। যুক্তরাজ্যের চিকিৎসক গডফ্রে ও তার সহকর্মীরা ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বড়দিন নিয়ে গবেষণা করার সময় আবিষ্কার করেন যে, বড়দিনের সময় গৃহসজ্জার কাজগুলো করার সময় এগুলো আমাদের মধ্যে অতীতের সুন্দর স্মৃতিগুলোকে জাগিয়ে তোলে। আর সুন্দর স্মৃতিগুলোর ফলে মস্তিষ্ক ইতিবাচক নিউরোট্রান্সমিটার ডোপামিন, সেরোটোনিন ও অক্সিটসিন নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। যার ফলে আমাদের মধ্যে হাসি-খুশি, সন্তুষ্টিবোধ, শিথিলতা বৃদ্ধি পায় এবং মানিসক চাপ ও উদ্বিগ্নতা হ্রাস পায়।

বড়দিন উদ্‌যাপনের সাথে সম্পৃক্ত গান ও কীর্তন আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। স্ট্যানফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক Kelly McGonigal তার *The Joy of Movement* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,"পছন্দের সঙ্গিত হলে মস্তিষ্ক শক্তিশালী এড্রিনালিন, ডোপামিন এবং এন্ডরফিন নিঃসরণ ঘটায় যা আমাদের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে এবং শারীরিক ব্যথা নাশ করে।" ফলে যখন আমরা একত্রিত হই, বড়দিনের কীর্তন করি ও কৃতজ্ঞতা-প্রশংসার গান করি তখন এটি আমাদের মেজাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং এমনকি আমরা যে শারীরিক ব্যথা অনুভব করছি সেটির উপর একটি বেদনানাশক প্রভাব বিস্তার করে।

বড়দিনের সময় আমরা যেমন প্রচুর উপহার আদান-প্রদান করি তেমনি আবার দরিদ্র, অসহায়কে সাহায্য ও স্বেচ্ছাশ্রম দান করি। বড়দিনের এসব কাজ আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা বলে যখন আপনি অন্যকে দান করেন তখন আপনার মস্তিষ্ক এন্ডরফিন নিঃসরণ করে আর এর প্রভাবে আপনার মধ্যে ভালো লাগা কাজ করে। তাছাড়া মস্তিষ্ক অক্সিটোসিন নিউরোট্রান্সমিটারেরও নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়; যার ফলে আপনার মনে প্রশান্তি ও শিথিলবোধ সৃষ্টি হয়। দান করার ফলে সৃষ্ট এসব ইতিবাচক নিউরোট্রান্সমিটার আপানার মানসিক চাপ মোকাবিলা, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, উদ্বিগ্নতা ও বিষণ্নতা দূরীকরণ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যখন আপনি দান করেন তখন মনে রাখেন আপনি আরেকজনের মনে দান করার ব্যাপরে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দান করেন। কারণ দান করাটি একটি সংক্রামক। ফলে দান করার জন্য সমাজে আপনি একটি দারুণ চক্র সৃষ্টি করলেন। এর ফলে সমাজে দুঃখী-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যেমন উপকার হয় তেমনিভাবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধও জাগ্রত হয়।

যান্ত্রিক এই যুগে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এখন ভার্চুয়াল জগতেই হয়। কিন্তু ভার্চুয়াল জগৎ ও বাস্তবতার মধ্যে একটি বিশাল বড় ব্যবধান থাকে। সেই সাথে সাথে মানুষের অনুভূতিগুলো যেন মনে হচ্ছে যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে, সকল কিছুই যেন ইমো (Imo) নির্ভর হয়ে পড়েছে। যেমন কেউ ভার্চুয়াল জগতে পোস্ট দিলেন, তার এক আত্মীয় মারা গেছেন, আমরা তার পোস্টে দুঃখের ইমো (Sad imo) দিচ্ছি অথবা আমাদের কোন কিছু ভালো লাগছে আমরা তখন ভালোবাসার ইমো (Love imo) দিচ্ছি; আমরা কিন্তু এর বাইরে আর কোন কিছুই করছি না। তো দেখা যায় যে, যখন বড়দিন উদ্‌যাপিত হচ্ছে তখন পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, একসঙ্গে গির্জায় যাওয়া, কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো, ফোনে কথা বলা, এসএমএস করা, ঘুরতে যাওয়া, আনন্দ-হৈহুল্লড় করা ইত্যাদি তাদেরকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখে এবং একই সাথে সামাজিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

আমরা জানি বড়দিন মানেই অনেক বেশি খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া, আড্ডা দেওয়া, নিজের মত সময় কাটানো, পারিবারিক কোয়ালিটি সময় কাটানো। ফলে বড়দিনের সময় যেমন আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণভাবে শিথিল হওয়ার ও নতুন বছরে নতুনভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও অর্জন করি।

সুতরাং আমরা এইভাবে বলতে পারি যে, রীতিবদ্ধ বড়দিন উদ্‌যাপনে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়। তবে যেহেতু এটি একটি উৎসবের সময় সেহেতু প্রচুর খাবার আয়োজন, রাত জাগা, কেনাকাটা, ঘুরাঘুরি হবে কিন্তু মনে রাখবেন, পরিমিত পরিমাণ সুষম খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ, সময়মত ঘুমানো ও ওঠা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিকল্পনা ও সামর্থ অনুযায়ী অর্থ ব্যয় আপনার বড়দিনের আনন্দ আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে।

যিশুখ্রিস্টের এই জন্ম তিথি আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুক! শুভ বড়দিন!!

"যিশু জন্মেছে"
নির্মল এল গমেজ

যিশু জন্মেছে, যিশু জন্মেছে, যিশু জন্মেছে,
বেৎলেহেম গোশালে,
তোরা আয়, আয়রে আয়, আয়রে আয়।
(১) দূতগণে নাচিছে স্বর্গধামে মাতিছে,
আকাশের তারা দেখিলো পণ্ডিতেরা
যিশুকে তারা করিছে প্রণাম,
তোরা আয়, আয়রে আয়, আয়রে আয়
(২) শিশু যিশুর জন্মের বার্তা বহিছে গগনে,
যিশু জন্মের কারণে মুক্তি পেলাম সকলে
চলগো সবাই করি প্রণিপাত,
তোরা আয়, আয়রে আয়, আয়রে আয়

লোভ ও প্রেম
দিপালী কস্তা

আমি মানুষ,
অতি সাধারণ আটপৌরে মানুষ
আমার মধ্যে আছে লোভ-
প্রিয়ার উষ্ণ ভালোবাসা পাওয়ার লোভে
লোভী।
আছে মায়া-
এক অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে বন্দী এই
ভুবনে।
মায়াজালে আটকে আছি এই সংসারে।
আছে দয়া-
অসহায় মানুষের কষ্টে হৃদয় কাঁপে।
আছে প্রেম,
প্রিয় জনের মনটাকে বাঁধি বিনা সূতার
মালায়
নির্ভেজাল আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠি।
আছে স্বার্থপরতা,
কারণ আমি ভালোবাসার বিনিময়ে
ভালোবাসি,
হাসির বিনিময়ে হাসি,
কারো কান্না দেখে কাঁদি।
নিজের কাছে নিজেকে লুকাই,
স্বার্থপর আমিটাকে ছুড়ে ফেলি
নর্দমায়,
তাই তো মিথ্যার মোহে নয়,
সত্যকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে শিখি,
সত্যের আলোয় জীবনে হই মুখোমুখি।

নারী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় করণীয়

ডা. জেসি জেকলীন রোজারিও

World Health Organization বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতিটি মানুষের শারিরীক ও মানসিক গঠন এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বমোট ৭টি ধাপ বা পর্যায় রয়েছে। শিশু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রতিটি নারী পুরুষকে এই ধাপগুলোতে সাধারণ থেকে জটিলতর মানসিক কিংবা শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। আজ বিশেষত নারীদের কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করবো-

বিশেষ করে বয়ঃসন্ধি ক্ষণে বা Adolescent পর্যায়ে প্রতিটি কিশোর-কিশোরী কিছু নতুন পরিবর্তন ও সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেখানে শরীরের হরমোনগুলোতে আসে বিপুল পরিবর্তন, তারা কিছুটা ভয় এবং বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। যেমন- হঠাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, প্রজনন তন্ত্রে পরিবর্তন, ওজন বাড়া ও হঠাৎ কমে যাওয়া, মাসিক শুরু হওয়া, অনিয়মিত কিংবা বেশি রক্তপাত হওয়া, থাইরোয়েড (Thyroid) হরমোনে সমস্যা, ঘনঘন প্রস্রাবে প্রদাহ, ডিম্বাশয়ে সিস্ট (Polycystic ovary syndrome), জরায়ুতে পলিপ (Polyp) অথবা Fibroids, স্তনে ব্যথা ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন, ক্ষুধামন্দতা ও অনিদ্রা এবং চুলপড়া ও চর্ম সমস্যা।

বয়ঃসন্ধিতে করণীয়

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক যুগে এই বয়সে অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপ, অনলাইনে ক্লাশ, মোবাইল ও কম্পিউটার এর উপর অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হারিয়ে ফেলছে তাদের দৈনন্দিন শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সাঁতার, নাচ-গান ও বিনোদনের সুযোগ। ফলে শরীরের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন, হরমোনের ভারসাম্য, চোখের জ্যোতি, মস্তিষ্কের বিশ্রাম হচ্ছে ব্যাহত। অতিরিক্ত রেডিয়েসন (Radiation) ও মোবাইল আসক্ততা আমাদের নরম চোখের রেটিনার কর্মক্ষমতা কে কমিয়ে দিচ্ছে, অনিদ্রা ও ক্ষুধামন্দতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এই সময় আমাদের উচিত নিয়মিত ব্যায়াম এর পাশাপাশি সুষম খাদ্যাভাস গড়ে তোলা। একটানা বসে পড়াশুনা বা কম্পিউটার চালানোর ফলে শরীরে যে চর্বি বা স্থুলতার সৃষ্টি হয়, তা থেকে মেয়েদের হরমোনের তারতম্যতা ঘটে-জরায়ু বা ডিম্বকে দেখা দেয় নানা ধরনের সমস্যা। স্থুলতার কারণে অনেকে নানা ধরনের ডায়েট করে, ফলে লিভার ও কিডনীতে, পাশাপাশি হজম শক্তিতে দেখা দেয় সমস্যা। তাই এক এক জনের শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েট চার্ট মেনে চলা উচিত। এছাড়া ওজন বাড়ার জন্য দায়ী হরমোনগুলোর পরীক্ষা করা জরুরী।

জরায়ু ও প্রজনন তন্ত্রের সুরক্ষার জন্য উচিত:

- সঠিক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা

- প্রতি রাতে ঘুমের আগে কুসুম গরম পানিতে লবণ দিয়ে পরিচ্ছন্ন করা

- মাসিকের সময় ব্যথা হলে তলপেটে গরম স্যাকা নেওয়া। বেশি সময় ধরে টাইট-ফিট অন্তর্বাস ব্যবহার না করা

- চার থেকে ছয় ঘন্টা পর পর মাসিকের ন্যাপকিন পরিবর্তন করা

- প্রস্রাবে প্রদাহ এড়াতে নিয়মিত সাড়ে তিন লিটার পানি কিংবা ফলের রস, স্যুপ ইত্যাদি তরল জাতীয় খাদ্যাভাস গড়ে তোলা।

- মোবাইল বা কম্পিউপার স্ক্রিনে ৩০মিনিট এর বেশি চোখ না রাখা এবং একটি চোখের Protector ব্যবহার করা।

- মোবাইলের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আমাদের চোখের রেটিনা ও ব্রেনের নিউরনগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমাদের চিন্তাশক্তি ও মনে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, অল্পতেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

- এছাড়া জেনে রাখা ভালো, যারা বেশি রাত পর্যন্ত মোবাইল চালায়, তাদের ব্রেন থেকে মেলাটোনিন (Melatonin) নামক এক ধরনের হরমোন, যা আমাদের নিয়মিত ঘুম আসার জন্য নিঃসরণ হয়, সেই মেলাটোনিন নিঃসরণ ব্যাহত হয়, ফলে ধীরে ধীরে অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতায় ভুগতে হয়। তাই খুব প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল বা কম্পিউটার বেশি না চালানোই ভালো।

- যাদের অতিরিক্ত সাদা স্রাবের সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি লুকিয়ে না রেখে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধের একটি কোর্স গ্রহণ করা উচিত। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ এই সাদা স্রাব বা Leucorrhoea এর সমস্যা থাকলে পরবর্তীতে জরায়ুতে ইনফেকশন এমনকি ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে।

প্রজনন সময়কাল (Reproductive Period): এই পর্যায়টি মেয়েদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্যই হলো ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। এই সময়কালে মেয়েরা যে সমস্যাগুলোতে ভোগে তার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো, যৌনাঙ্গে অথবা জরায়ুর মুখে ঘন ঘন ইনফেকশন। এছাড়া রয়েছে- গর্ভধারণে সমস্যা, গর্ভপাত জনিত জটিলতা, সাময়িক বন্ধ্যাত্ব, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি বা পিল ঘটিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, স্তনে টিউমার অথবা Fibro cystic breast disease, রক্তশূন্যতা বা Anemia, গর্ভাবস্থায় ডায়বেটিস (Gestational Diabetes), ত্বকে মেছতা পড়া ইত্যাদি।

প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় আমাদের করণীয়

বিবাহ বন্ধনের পূর্বেই STD (Sexual Transmission disease) এর পরীক্ষা করে নেওয়া। যদিও আমাদের দেশে এ ব্যাপারে এখনও তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এখন এই পরীক্ষা গুলো রুটিন চেকআপ এর আওতায় আনা হচ্ছে।

- ঘন ঘন পিল বা, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়া থেকেও আমাদের বিরত থাকতে হবে।

- সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যসম্মত সহবাসের অভ্যাস ও শিক্ষা (Sex Education) থাকাটা জরুরী।

- যারা মাসিকের সমস্যা কিংবা Poly Cystic Ovary-র কারণে দীর্ঘদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন করে যাচ্ছেন তাদের অবশ্যই বছরে অত্যন্ত একবার জরায়ুর পরীক্ষা (Pap Smear), স্তনের ও রক্তের কিছু পরীক্ষা বিশেষজ্ঞের মতামত অনুযায়ী করানো উচিত।

- গর্ভধারণের জন্য কিংবা গর্ভপাতের জটিলতায় যারা নানা ধরনের হরমোনের ইনজেকশন নিচ্ছেন তাদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম, সুষম খাদ্যাভাস, মানসিক প্রশান্তি এবং জরায়ুর ভেক্সিন ইত্যাদি নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য মিষ্টি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য বেছে খেতে হবে, প্রয়োজনে ইনসুলিন গ্রহণ করাটা, মা ও শিশু উভয়ের জন্যই নিরাপদ।

- মাতৃত্বকালীন সময়ে মেয়েদের শরীরে Iron I Calcium এর ঘাটতি দেখা দেয়। তাই নিয়মিত দুধ, ডিম, খেজুর, কলা, বাদামের, পাশাপাশি দিনে অত্যন্ত একটি করে ভিটামিন সাপিমেন্ট গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।
- এসময় মেয়েরা এবং মায়েরা চুল ও ত্বকের সমস্যায় বেশি ভোগেন। তাদের ক্ষেত্রে জেনে রাখা খুবই জরুরী বাজারের নানা ধরনের রং ফর্সাকারি ক্রিম ও চুলের তেলগুলোতে উচ্চ মাত্রার স্টেরয়েড (Steroid) ও ব্লিচ জাতীয় ক্যামিকেল ব্যবহার করা হয়, যা ত্বকের ইনফেকশন ও ক্যান্সারের জন্য দায়ী। অনেক প্রসাধনীতে মাত্রাতিরিক্ত Lead বা সীসা ব্যবহৃত হয়, যা খুবই বিষাক্ত। তাই যে কোনো প্রসাধনী কেনার সময় SPF (Sun Protection Factor) ৩০-৫০ পর্যন্ত দেখে ব্যবহার করা ভালো। পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভাবে চুল ও ত্বকের পরিচর্চা করা সবচেয়ে উত্তম।
- একটি রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে, যারা যত বেশি মোবাইল বা, কম্পিউটার ব্যবহার করেন, তাদের ব্রেনের হাইপোথ্যালামস (Hypothalamus) থেকে Gonadal Sex Steroid, যা আমাদের প্রজনন হরমোন নামে পরিচিত-তার নিঃসরণ কমে যায়। ফলে নারী পুরুষের মধ্যে, কোনো কারণ ছাড়াই সাময়িক বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। যার পরবর্তী চিকিৎসাগুলো খুবই ব্যায় বহুল।

মেনোপজ (Meno Pause)

এই পর্যায়ে প্রতিটি মহিলা এক ধরনের চাপা আতঙ্কে ভোগেন। বয়স চল্লিশের পর প্রতিটি নারীকেই এই ধাপে হরমোনের তারতম্যতার কারণে বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। এই মেনোপজ এর ৩টি ধাপ রয়েছে, যা আমাদের জানা খুবই জরুরী-

১) মেনোপজ শুরুর ২ থেকে ৩ বছর আগে থেকে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়, এটা অনেকের বয়স চল্লিশের আগেও শুরু হতে পারে আর এই সময়ই সবাই বেশ চিন্তিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

২) মেনোপজ (যাদের মাসিক একবারেই বন্ধ হয়ে যায়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বছরে ১-২ বার একটু রক্তপাত দেখা দিতে পারে)

৩) পোষ্ট মেনোপজ যারা অনেক বছর আগেই জরায়ুর অপারেশন করে ফেলেছেন কিংবা মাসিকের সকল লক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে

মেনোপজের এই ধাপগুলোতে নারীরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো:-

১) **হট ফ্ল্যাশ (Hot Flash):** এটা সবাইকে খুব ভোগায়। কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ ভীষণ গরমলাগা, সেটা খুব ঠাণ্ডার দিনেও হতে পারে) মাথার মাঝখানটা গরম বা জ্বালা করা, কানের মধ্যদিয়ে মনে হয় গরম বায়ু বেরুচ্ছে, প্রেসার হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ও অস্থির লাগা। কয়েক সেকেণ্ড থেকে মিনিট দশেক পর আবার আপনা-আপনিতেই ঠিক হয়ে যাওয়া।

২) **যৌন মিলনে অনিহা:** শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেসটেরন হরমোন এর উৎপাদন কমে যাওয়ায় শারীরিক ভাবে এ আগ্রহ অনেকটা কমে যায়, পাশাপাশি যোনিপথ অনেক বেশি শুষ্ক হয়ে যায়।

৩) **হাড়ে ও জয়েন্টে ব্যাথা:** শরীরের নানা অংশে ব্যথা অনুভুত হয়। শরীরে ইস্ট্রোজেন ঘাটতির কারণে হাড় ক্ষয়ের প্রভাবে কোমড়, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি, ঘাড়ে, ব্যাথা শুরু হয়, যাকে বলা হয়ে থাকে Post-menopausal Osteoporosis.

৪) **ওজন বৃদ্ধি:** হরমোনের তারতম্যের কারণে দ্রুত ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure), রক্তের চর্বি বেড়ে যাওয়া, হার্টএর সমস্যা, ব্রেন স্ট্রোক ও ক্যান্সারের ঝুঁকি। এ সময় স্তনে টিউমার ও জরায়ুতে অথবা ডিম্বকে নানা ধরনের ছোট-বড় টিউমার দেখা দেয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

৫) **মুড সুইং (Mood Swing) ও অনিদ্রা (Insomnia):** এ সময় শরীরে সেরোটোনিন (Serotonin) ও ডোপামিন (Dopamine) হরমোনের ঘাটতির কারণে ঘনঘন মেয়েদের মেজাজ পরিবর্তিত হয় এবং রাতে পর্যাপ্ত ঘুম ব্যাহত হয়।

৬) **চুলপড়া ও চামড়ার ভাঁজ পড়া:** শরীরে ইসট্রোজেন (Oestrogam) হরমোন, যাকে বলা হয় Beauty Hormone, কারন এটি Hyaluir onic acid তৈরিতে সহায়ক, যা মেয়েদের চুল ও ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তা কমে যাওয়ায় হঠাৎ অতিরিক্ত চুলপড়া ও চামড়ায় মেছতা, ভাঁজ ও খসখসে অমসৃনতা ইত্যাদির সমস্যাগুলো শুরু হতে থাকে।

মেনোপজে আমাদের করণীয়

- চিকিৎসার চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবারের সবার সাপোর্ট বা সহযোগিতা। এই সময় মেয়েরা বা মায়েরা তাদের শরীর ও মানসিক অবস্থার ভারসাম্য হারান কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারেন না। তাই স্বামী ও সন্তানদের উচিত তাদের এই চড়া বা উগ্র মেজাজ, শরীরের ব্যথা-যন্ত্রণা, বেশি কথা বলা, উত্তেজিত হয়ে ওঠা-এ গুলোকে অবহেলা না করে সহমর্মিতার সঙ্গে ধৈর্য ধরা ও প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা।

- ডায়বেটিস ও কোলেষ্টরল বা রক্তে যেন চর্বি জমতে না পারে, সেজন্য উচিত দিনে অথবা সন্ধ্যায় অত্যন্ত ৮০ মিনিট হাঁটা অথবা যোগ-ব্যায়াম করা। খাদ্য তালিকা থেকে চিনি বা শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং মসলা জাতীয় মুখোরোচক ও শাক সবজি গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অতিরিক্ত পাকা ফল বাদ দিয়ে একটু সবুজ বা আধাপাকা ফলমূল (সবুজ আপেল, সবুজ মালটা, আমলকি, পেয়ারা, খেজুর, আধা-পাকা কলা, কচি ডাবের পানি) ইত্যাদি খেতে হবে। এ সময় বাদাম, তিল, তিসি, মেথি, শরীরের জন্য বেশ উপকারী।

- অস্টি ও পোরোসিস বা হাড় ক্ষয় এড়াতে, মেনোপজের শুরুতেই ক্যালসিয়াম, ভিটামিনের সাপিমেন্ট খাওয়া শুরু করতে হবে। ইউরিক এসিড যুক্ত খাদ্য (গরুর মাংস, ডাল, বীজ খাদ্য, ঢেড়স ও ইত্যাদি) পরিমিত হারে খাওয়া উচিত। তা না হলে ব্যথা দূর হবে না। কোনো কারণে হাঁড়ের ব্যথা ও জয়েন্ট ফুলে গেলে অবশ্যই চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

কিডনী ভালো রাখার জন্য মেপে পরিমাণ মত পানি খেতে হবে। অতিরিক্ত বেশি বা কম পানি কিডনীর জন্য ক্ষতিকর। দিনে অত্যন্ত ৩ থেকে ৩.৫ লিটার পানি খেতে হবে। তবে যাদের কিডনীর সমস্যা আছে তারা অবশ্যই ক্রিয়েটিনিন (Creatinine) অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে পানি পান করবেন। ঘন দুধ এর পরিববর্তে পাতলা দুধ খেতে পারেন। এছাড়া যে কোন ধরনের ডাল না খাওয়াই ভাল । পেপে, লাউ, জালি, ঝিঙা, চিচিঙ্গা এই ধরনের সব্জিগুলো বেশি খেতে পারেন।

- অতিরিক্ত হট ফ্ল্যাশ এড়ানোর জন্য ঢিলেঢালা-সুতির কাপড় পরিধান করা উচিত। বেশি মোটা আট-শাট কাপড়ে ঘাম ও অস্থিরতা বেড়ে যেতে পারে। তাপে বা গরমে, রান্না ঘরে যতটা পারেন কম সময় ব্যয় করবেন। ঠাণ্ডা স্থানে থাকবেন অতিরিক্ত চিন্তা, মানসিক চাপ নিবেন না, খাদ্য তালিকায় তরল খাদ্য যেমন: পানি, স্যুপ, ফলের রস বাড়িয়ে দেবেন এবং রাতে পরিমিত ঘুমের সদভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ফোনে বেশি কথা বলা, টিভি বা, ল্যাপটপে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো।

(৯৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাঁটু ব্যথার কারণ, প্রতিকার, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

অনেকেই আমরা হাঁটুব্যথা রোগে ভুগে থাকি। হাঁটুব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা কিন্তু এতে আমরা অনেক ভুগি ও অনেকেই এতে খুব কষ্ট পেয়ে থাকি। এই ব্যথা অনেক ক্ষেত্রেই তীব্র হতে পারে। ফলে অনেকেরই চলাচল কষ্টকর হয়ে পড়ে, অনেকেই নিশ্চল হয়ে পড়েন। জগতে ১৫-২০% পুরুষ এ রোগে ভুগে। আবার পুরুষ থেকে মহিলারা এ সমস্যায় ভুগে, যা প্রায় ২০% - ৫০% বা তার বেশি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এটা যে কোন বয়সেই হতে পারে। ব্যায়াম করতে গিয়ে বা দূর্ঘটনায় পড়ে গিয়েও হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে। প্রথমে এটা অল্প, পরে তা আস্তে আস্তে বাড়তে পারে। হাঁটুতে আর্থাইটিস রোগে আমেরিকাতে প্রায় প্রতি বছর ১৫ লক্ষ লোক ভুগে অর্থ্যাৎ প্রতি ৪ জনে ১ জন এ রোগে ভুগে। এক হাঁটুতে বা উভয় হাঁটুতে অসুবিধা হতে পারে। আজকে আমরা এর কারণ, প্রতিকার, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বিষয়ে ধারণা লাভ করব।

হাঁটুব্যথার সাধারণ কারণ

১) দূর্ঘটনার কারণে লিগামেন্ট ছিড়ে যাওয়া, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, মাংশপেশী ছিড়ে যাওয়া ইত্যাদি
২) বয়স বৃদ্ধি
৩) হাঁটুতে পুন:পুন: আঘাত
৪) অস্টিওআর্থাইটিস
৫) আর্থাইটিস
৬) রিওমাটয়েড আর্থাইটিস
৭) গেটেবাত/গাউট

হাঁটুব্যথার সাধারণ উপসর্গ

১) হাঁটু ফোলা
২) হাঁটু লাল হয়ে যাওয়া, হাঁটু গরম হয়ে যাওয়া
৩) হাঁটুতে ব্যথা/ তীব্র ব্যথা
৪) হাঁটুতে জোর না পাওয়া
৫) উঠতে বসতে ব্যথা
৬) হাঁটু ভাজ করতে না পারা
৭) ওজন নিতে না পারা
৮) হাঁটতে গেলে সমস্যা/ হাঁটাচলা করতে না পারা
৯) হাটতে গেলে সমস্যা
১০) এক হাঁটুতে সমস্যা হলে অন্য হাঁটুতে চাপ পরা
১১) হাঁটু লম্বা করতে গেলে অসুবিধা হলে
১২) হাঁটু ভাজ করতে গেলে মৃদু শব্দ হওয়া ইত্যাদি

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

১) ওজন নিতে না পারা
২) হাঁটু ফোলা
৩) হাঁটু লম্বা করতে গেলে অসুবিধা হলে
৪) হাঁটু ভাজ করতে গেলে মৃদু শব্দ হওয়া
৫) হাঁটুতে কোন বড় ক্ষতি বোঝা গেলে
১৩) জ্বর, হাঁটুতে ব্যথা/তীব্র ব্যথা, হাঁটু লাল হয়ে যাওয়া, হাঁটু গরম হয়ে যাওয়া
১৪) দুর্ঘটনা জনিত কারণে হাঁটুতে ভাঙ্গন বা ফ্রাকচার ইত্যাদি

হাঁটুব্যথার ঝুঁকি

১) **অতিরিক্ত ওজন:** হাঁটুব্যথার এটি অন্যতম প্রধান কারণ। অতিরিক্ত ওজনের কারণে হাঁটুর ওপরে অনেক চাপ পড়ে। সাধারণত আমাদের শরীরে ওজন কোমর হয়ে, হাঁটু হয়ে পা দিয়ে মাটিতে যায়। তাই ওজন কমাতে পারলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাঁটুব্যথা কমে।
২) **হাঁটুর দুর্বল মাংশপেশী:** ব্যায়ামের মাধ্যমে হাঁটুর দুর্বল মাংশপেশী সবল করা যায়।
৩) অতিরিক্ত বয়স
৪) বিভিন্ন রোগ- যেমন: ডায়াবেটিকস্ ইত্যাদি
৫) **বিভিন্ন পেশা/খেলাধূলা:** যে সকল পেশায়

ছবি: ইন্টারনেট

লম্বা সময় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, তা হাঁটুর জন্য ঝুকিপূর্ণ। যারা খেলোয়াড়, তাদের পেশা/খেলাধূলার কারণে তাদের হাঁটু ঝুঁকিপূর্ণ থাকে।
৬) লম্বা সময় এক জায়গায় বসে কাজ করা। কায়িক পরিশ্রম কম করা।
৭) নারীর ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি/অল্প বয়সে মাসিক শেষ/মেনোপোজ হওয়া।
৮) হাঁটুতে পূর্বে কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে চিকিৎসা নিলে ইত্যাদি।

রোগ সনাক্তকরণ

১) আক্রান্ত হাঁটুর এক্সরে/আলট্রাসাউন্ড/সিটি স্ক্যান/এমআরআই করা যেতে পারে।
২) সিরাম ইউরিক এসিড টেস্ট করার মাধ্যমে গেটেবাত/গাউট রোগ আছে কিনা বোঝা যেতে পারে।
৩) প্রয়োজনে এমবিবিএস বা ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করা।

চিকিৎসা

ক) মেডিকেল চিকিৎসা:

১) দৈনন্দিন জীবনাচরণে পরিবর্তন অনতে হবে।
২) পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে।
৩) অনেকক্ষেত্রে বরফ বা গরম-ঠাণ্ডা সেক দিলেও উপকার হতে পারে।
৪) আক্রান্ত হাঁটু বালিশের উপর উচুঁ করে রাখতে হবে।
৫) ব্যথানাশক ঔষধ ভরাপেটে খেতে পারেন। এর পূর্বে কিডনী ঠিক আছে কিনা জানা দরকার।
৬) গেটেবাত/গাউট এর চিকিৎসা করা যেতে পারে।
৭) ফিজিওথেরাপি মাংশের জোর বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
৮) প্রয়োজনে এমবিবিএস বা ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করা।
৯) হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ মোতাবেক হাঁটুতে স্টেরয়েড এনজেকশন দেয়া যেতে পারে। হাআলোরোনিক এসিড এনজেকশন বা প্লাটিলেট রিচ প্লাসমা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর পরামর্শ মোতাবেক।

খ) সার্জিক্যাল চিকিৎসা

১) প্রয়োজনে এমবিবিএস বা ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করা।
২) হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করে প্রয়োজনে হাঁটুর অপারেশন বা নী রিপ্রেসমেন্ট করা যেতে পারে।
৩) **অন্যান্য অপারেশন:** অর্থোপ্লাস্টি/পার্সিয়াল নী রিপ্রেসমেন্ট/অস্টিওটোমি ইত্যাদি করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ

১) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। এর জন্য কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে হবে। প্রচুর শাক-সবজি খেতে হবে।
২) ডায়াবেটিকস্ থাকলে তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখা।
৩) গেটেবাত/গাউট থাকলে লালশাক, ঢেড়শ, কলিজি, হাঁসের মাংশ ও ডিম, বরবটি, মগজ, কচু, কচুর লতি, মুসারি ডাল প্রভৃতি না খাওয়া।
৪) নিয়মিত নিয়ম মেনে খেলাধূলা করা। শরীরের মাংশপেশী শক্তিশালী করা।
৫) যে সকল ব্যায়াম করলে অসুবিধা হয়, তা বন্ধ রাখা।
৬) প্রয়োজনে এমবিবিএস বা ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাড়-জোড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করা।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা:

১) ইন্টারনেট॥

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2022-2023/481 Date: 08 December, 2022

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for qualified candidates as described below:

Position: Database Administrator, ICT Department

Duty Station: The CCCUL, Dhaka Head Office/ Extended Building

Key Job Responsibilities:

- Design, develop, script writing of databases in MS SQL Server.
- Install, configure, and continuously optimize MS SQL Server database instances
- Perform day-to-day management, patching, maintenance, and backup of all databases
- Ensure systems remain secure and are continuously running effectively and meet system/user requirements
- Participate in upgrades and configuration modifications on the production systems
- Develop scripts and create reports for database health monitoring and usage metrics analysis
- Generate reporting queries and on-demand reports.
- Collect and prepare daily health status report for production databases
- Drive a total automation philosophy to efficiently and effectively achieve high level of reliability, availability, scalability, security, and performance.

Educational Requirements:

- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE) or equivalent
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 5-year experiences in the related field in reputed organizations.

Additional Requirements:

- Age maximum 40 years
- Must have strong knowledge on SQL Based ERP database.
- Must have clear concept on data warehousing, data mining and similar.
- Experience on maintaining large database will be highly appreciated.
- Strong SQL and data model optimization abilities
- Experience with pro-active monitoring and knowledge of database monitoring tools.
- Experience using backup tools and technologies
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent communication & documentation skills
- Ability to work as part of a team in a fast-paced dynamic environment
- Strong command of English language

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a Cover letter/forwarding letter and send to the following address by **15th January, 2022.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2022-2023/481 Date: 08 December, 2022

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for qualified candidates as described below:

Position: Database Administrator, ICT Department

Duty Station: The CCCUL, Dhaka Head Office/ Extended Building

Key Job Responsibilities:

- Design, develop, script writing of databases in MS SQL Server.
- Install, configure, and continuously optimize MS SQL Server database instances
- Perform day-to-day management, patching, maintenance, and backup of all databases
- Ensure systems remain secure and are continuously running effectively and meet system/user requirements
- Participate in upgrades and configuration modifications on the production systems
- Develop scripts and create reports for database health monitoring and usage metrics analysis
- Generate reporting queries and on-demand reports.
- Collect and prepare daily health status report for production databases
- Drive a total automation philosophy to efficiently and effectively achieve high level of reliability, availability, scalability, security, and performance.

Educational Requirements:

- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE) or equivalent
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 5-year experiences in the related field in reputed organizations.

Additional Requirements:

- Age maximum 40 years
- Must have strong knowledge on SQL Based ERP database.
- Must have clear concept on data warehousing, data mining and similar.
- Experience on maintaining large database will be highly appreciated.
- Strong SQL and data model optimization abilities
- Experience with pro-active monitoring and knowledge of database monitoring tools.
- Experience using backup tools and technologies
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent communication & documentation skills
- Ability to work as part of a team in a fast-paced dynamic environment
- Strong command of English language

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a Cover letter/forwarding letter and send to the following address by **15th January, 2022.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

ভ্রমণকাহিনী

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের তীর্থস্থান গোয়াতে বাংলাদেশ কাথলিক টিচার্স টিম

হিউবার্ট যোসেফ গমেজ

ইন্ডিয়া কাথলিক টিচার্স টিমের ৫০ বৎসরের জুবিলী ও ন্যাশনাল সেমিনার ২০১৬ তে অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কাথলিক টিচার্স টিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমাদের টিচার্স টিমের প্রাক্তন চ্যাপলিন ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি এক সভায় আমাদের জানালেন যে তিন জন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে গোয়াতে যাওয়ার। আমি তখন প্রস্তাব করলাম আরো বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি ওখানে যাওয়া যাবে কিনা? ব্রাদার নির্মল বললেন ঠিক আছে আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারি। ইন্ডিয়া টিচার্স টিমের জুবিলী উদ্‌যাপন কমিটির সাথে ইমেইল ও ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হল আমরা ৮/১০ জন যেতে পারব। কোটা অনুযায়ী আঠারগ্রাম অঞ্চল থেকে ৪ জনকে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট, ভিসা, পারিবারিক সমস্যার কারণে পরবর্তীতে কেউ যেতে চাইলো না। শুধু আমিই আঠারগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব করলাম। শেষ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশ থেকে ৬ জন শিক্ষক আমরা তীর্থভূমি গোয়াতে ITT এর Golden জুবিলীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

তন্মধ্যে ছিলাম ন্যাশনাল কমিটির সেক্রেটারী দিগন্ত রড্রিক (ভাওয়াল অঞ্চল থেকে), প্রয়াত ট্রেজারার আলো গুদা (বরিশাল), প্রয়াত নয়ন রোজারিও (সাভার অঞ্চল), পাস্কা গমেজ ও তার স্বামী (ঢাকা অঞ্চল), আমি ন্যাশনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর (আঠারো গ্রাম অঞ্চল)।

যথাসময়ে অর্থাৎ ১৯ মে বৃহস্পতিবার সকালে ITT সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবো কিনা, আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কারণ ১৩ মে তারিখ থেকে বাংলাদেশে আন্তঃ জিলা বাস সার্ভিসে হরতাল চলছে। এদিকে নয়ন স্যারের ইন্ডিয়া ভিসা পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। যা হোক দুই মন দুই আশা নিয়ে ১৬ মে সোমবার বিকালে বান্দুরা থেকে বাসে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল মে মাসের ১৭ তারিখে সকালের ট্রেনের টিকিট যদি পাই তাহলে ট্রেনে রওনা দিব। বাসে বসে হঠাৎ করে মনে পড়ল আমার কাছে শ্যামলী পরিবহনের ভিজিটিং কার্ড আছে। যেই ভাবা সেই কাজ। শ্যামলী কাউন্টারে ফোন করলাম।

- "দাদা, আপনাদের ঢাকা-কলিকাতা বাস সার্ভিস চালু আছে?
- জ্বি, চালু আছে?
- আজ রাতে বাস আছে?
- জ্বি না, কাল সকালে ৭.৩০ মিনিট বাস ছাড়বে।
- ৩ টা সিট পাওয়া যাবে?
- সরি দাদা, কোন সিট খালি নেই।
- কোন দিনের সিট পাওয়া যাবে আপনাদের গাড়ীতে?
- আগামী তিন দিন কোন সিট খালি নেই।
- দাদা অন্য কোন বাস সার্ভিস চালু হয়েছে?
- গ্রীন লাইন, সোহাগ চলছে।
- কোথায়/কোন কাউন্টারে আমি যোগাযোগ করবো?
- আপনি আরামবাগ আসলে সবগুলি কাউন্টার পাবেন।
- ওকে, ধন্যবাদ আপনাকে।

আমি দিগন্ত স্যারকে ফোন করলাম, "দিগন্ত স্যার, বাস চলতেছে। আমি তাহলে আরামবাগ গিয়ে খোঁজ নেই।" সত্যিই মতিঝিল সোহাগ কাউন্টারে গিয়ে তিনটা টিকিটই পেলাম। রাত সাড়ে ৯ টায় বেনাপোলের উদ্দেশে বাস ছাড়বে। আমি দিগন্ত স্যারকে ফোন দিলাম আবার। "স্যার তিনটা টিকিট পাওয়া গেছে, টিকেট কাটব?" স্যার বললেন কাটেন। আমি বললাম আপনি নাগরী থেকে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছাতে পারবেন? স্যার বলল, "এখন কয়টা বাজে?" আমি বললাম প্রায় ৭টা। স্যার বললেন, - "আমি ঠিক সময়ে আসতে পারবো, আপনি টিকেট কাটেন।" পিছনের তিনটি সিট পেলাম। কিন্তু উপায় নেই, শত কষ্ট হলেও আমাদের যেতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আলো দিদিকে ফোন করে বললাম, আপনি ৯ টার মধ্যে বাস কাউন্টারে চলে আসেন। আলো দিদিও অনেক কষ্ট করে, অনেক গাড়ী চেঞ্জ করে বরিশাল থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছিল। যাহোক, ১৭ মে ভোরে আমরা বেনাপোল-হরিদাসপুর স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন শেষ করে কলিকাতা মারকুইচ ষ্ট্রীটে গিয়ে নামলাম বিকালের দিকে। আমার এক পূর্ব পরিচিত সুজিতদার সাথে আগেই টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। আমরা বাস থেকে নেমেই তাকে পেয়ে গেলাম। অনেক বড় মাপের মানুষ উনি। অনেক আন্তরিক ও দায়িত্বশীল। ওনার প্রতি আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সুজিতদা আমাদের কলিকাতা রেলওয়ে ভবন সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়ে ফরেন কোটায় কলিকাতা টু বোম্বে ৩টা টিকেট কেটে দিলেন। সরাসরি গোয়ার টিকেট পাওয়া যায়নি। ১৭ মে রাতে আমরা দমদম সুজিতদার বাসায় থাকলাম। বিকালটা আমরা গঙ্গার পাড়ে মিলেনিয়াম (ঐতিহাসিক) পার্ক পরিদর্শন করলাম। এরপর ছোট স্টিমার ফেরী দিয়ে নদী পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে গেলাম। ফেরার সময় বাসে করে হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে দমদমে সুজিতদার বাসায় গেলাম, পরের দিন সকালে হাওড়া থেকে ট্রেনে করে বোম্বের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রদেশ হয়ে ১৯ মে সকালে বোম্বে পৌঁছালাম।

যাত্রা পথের বিশাল খোলামেলা প্রান্তর, ফসলের মাঠ, গ্রাম-গঞ্জ, শহর, বন্দর, বিভিন্ন সংস্কৃতির ও ভাষা-ভাষী গোষ্ঠির মানুষজন দেখার সু-বিশাল অভিজ্ঞতা হল। মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকা, তার মধ্যদিয়ে বৃটিশদের তৈরী করা অভূতপূর্ব ট্রেন লাইন, সত্যিই খুব বিস্ময়কর লাগল। ৭/৮টি পাহাড় কেটে তৈরি করা রাস্তা, তার মধ্যে সুরঙ্গ দিয়ে ট্রেন লাইন করা প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য কাজ ছিল। ট্রেন সার্ভিস ছিল খুবই আকর্ষণীয়। প্লেনে যেভাবে ফুড সার্ভিস থাকে, এখানেও সেই রকম ছিল। টিকিটের সাথেই ছিল সকালের ব্রেকফাষ্ট, দুপুরের লাঞ্চ, বিকেলের স্ন্যাকস ও রাতের ডিনার। ট্রেনে অবস্থানকালে এক ফ্যামিলির সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ওনারা বোম্বের অধিবাসী। কলিকাতা বেড়াতে আসছিলেন। এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য ওনার নিজের মোবাইলের টাকা খরচ করে অনলাইনে

বাসের টিকেটের রিজার্ভেসন দেন। ঠিক হলো ১৯ মে সন্ধ্যায় আমাদের বাস ছাড়বে। তাই আমরা বোম্বে স্টেশনে নেমে ট্যুর বাসে করে বোম্বের শহর দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। বোম্বে সমুদ্র বন্দর, ইন্ডিয়া গেট, যাদুঘর, প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন দালানকোঠা, ডিজিটাল হলে থ্রিডি ফিল্ম দেখলাম। সময় স্বল্পতার কারণে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পারিনি। সবচেয়ে ভাল লাগলো নয়নাভিরাম ইন্ডিয়া গেট। যেখানে রাণী ভিক্টোরিয়া সমুদ্র পথে ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে এসে প্রথমে ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন, সেখানে রাণীর স্মরণে এই গেট করা হয়েছে।

অন লাইনে বুকিং করা বাস সার্ভিস বাতিল হওয়াতে আমাদের অন্য সার্ভিস থেকে বাসের টিকিট কাটতে হল। পরের দিন সকালে আমরা গোয়ার পাঞ্জিতে গিয়ে নামলাম। বোম্বে থেকে গোয়া আসার পথের নৈসর্গিক দৃশ্য ছিল দেখার মত। বাসের প্রতিটি সিটের সাথে ছিল আলাদা ফ্যান ও মোবাইল চার্জ করার ব্যবস্থা। বিশাল চওড়া রাস্তা। পাঞ্জিম থেকে ট্যাক্সিতে করে আমরা ওল্ড গোয়ার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার চার্চ স্কোয়ারে গিয়ে পৌছালাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের ঠিক জায়গায় নিতে পারেনি। দিগন্ত স্যার ITT X Co-ordinator Maria Natirdade D' Souza কে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল St. Joseph Vaz Spiritual Renewal Centre কোথায়? আমরা ৫ মিনিটের মধ্যে একটা পাহাড়ের উঁচুতে নয়নাভিরাম এক চার্চে উঠলাম। চার্চের পাশেই Spiritual Renewal সেন্টার। অপূর্ব সৌন্দর্য মন্ডিতভাবে সাজানো গোছানো প্রতিষ্ঠান। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের নীচের ও দূরের বাড়ীঘর গাছপালা অপূর্ব সুন্দর লাগছিল।

গোয়ার তিনদিকেই সমুদ্র সৈকত এবং পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি স্টেট। আমরা তানজিম থেকে মিরামার বিচ এ গেলাম, এখানে আছে ইমাকুলেটা চার্চ, ডোনাপাল বিচ্। আগ্রাফোর্ট, অতি প্রাচীন একটি দূর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কোয়ারে আমরা প্রতিদিনই একবার করে গিয়েছি। প্রার্থনা করেছি, ছবি তুলেছি। পছন্দের জিনিস বই, রোজারিমালা, মূর্তি, মেডেল, সিডি ক্রয় করেছি। এই চত্বরে অনেকগুলি প্রাচীন গির্জা, ক্যাথেড্রাল, চ্যাপেল রয়েছে। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামে যে চার্চটা আছে সেটা সহ ঐ পুরো এলাকার বিল্ডিংগুলি এখন যাদুঘর হয়েছে, যা এখন ভারত সরকারের প্রত্নতাত্বিক বিভাগের অধীনে আছে। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মরদেহ যাহা ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে গোয়াতে আনা হয়। সেটা এখন রাখা আছে Bom Jesus Church এ; এখানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং সবসময় দশনার্থীদের জন্য খোলা রাখা হয়। এখানে আছে সেন্ট আগষ্টিন চার্চ, আউয়ার লেডী অফ মাউন্ট চ্যাপেল, সেন্ট পল কলেজ, যা ১৫৪২ সনে প্রতিষ্ঠিত, আউয়ার লেডী অফ রোজারী যেটা সবচেয়ে পুরাতন গির্জা; সেন্ট আগষ্টিন টাউয়ার, চার্চ অব কাজেটান, সি. ক্যাথেড্রাল, চ্যাপেল অব ক্যাথেরিন। অনেক গির্জার দেশ এই গোয়া।

এক পাশ দিয়ে উত্তরের পাহাড় থেকে সৃষ্টি মান্ডবি নদী দক্ষিণে আরব সাগরে গিয়ে মিলেছে। মান্ডবির অপর পাড়ে দেখা যায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। মন হারিয়ে যাবার অপার আকাশের নীলের মধ্যে সবুজের হাতছানি। ট্রেনের টিকিট না পাওয়াতে আমরা অনলাইনে প্লেনের টিকিট কেটে ২৪ তারিখ ৪:৩০ মিনিটে গোয়া এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতার উদ্দেশে প্লেনে উঠি। গোয়া থেকে কলকাতা পৌঁছাতে সময় লাগলো ২:৩০ মিনিট। প্লেন থেকে দেখা নীল আকাশের মাঝে ভাসমান মেঘগুলিকে মনে হচ্ছিল একেকটা ভেলার মত। আরেকটা দুর্লভ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হল আমাদের। ঘন মেঘের গভীরে যখন পজেটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুতের মাঝে সংঘর্ষের কারণে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় তখন মনে হচ্ছিল কেউ যেন বারবার লাইটার দিয়ে আলো জ্বালাচ্ছে আর নিভাচ্ছে। সত্যিই নয়নাভিরাম দৃশ্যটি। আমরা দমদম এয়ারপোর্টে নেমে বাসে করে কলেজ স্ট্রিটে গেলাম। কিন্তু কোন হোটেলে সিট পাচ্ছিলাম না। অবশেষে একজন বাংলাদেশী খ্রিস্টান মালিকানাধীন গেষ্ট হাউজে থাকার ব্যবস্থা হল। পরের দিন সকালে আমরা ব্যানার্জি রোডে মাদার তেরেজার আশ্রম পরিদর্শন করি। মাদার এর কবরে আমরা সকলের জন্য প্রার্থনা উৎসর্গ করি। অতঃপর তার স্মৃতি গ্যালারি আমরা দেখতে যাই। এরপর শপিং করতে গিয়ে আমরা আমাদের আলোদিদিকে হারিয়ে ফেলি। সে একটি দুঃখজনক ঘটনা হলেও কিছুটা মজার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। একটা ঘন্টা পর তাকে আমি খুঁজে পাই। এই ঘটনা লিখতে গেলে আরো দুই পৃষ্ঠা জায়গা লাগবে। আমরা ভেবে নিয়েছিলাম আজ আর আমাদের বাংলাদেশে ফেরা হবে না। দিগন্ত স্যারকে ইতিমধ্যে বাস কাউন্টারে পাঠানো হয়েছিল বাসের টিকেট বাতিল করার জন্য। যাহোক, দিদিকে পাওয়ার পর আমরা অতি দ্রুত গেষ্ট হাউস থেকে ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ সংগ্রহ করে বাস ছাড়ার পাঁচ/সাত মিনিট পূর্বে সিটে গিয়ে বসি। ২৬ মে বৃহস্পতিবার সকালে আমরা ঢাকা পৌঁছে যাই॥

নারী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় করণীয়

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী Hormone Replacement Therapy নিতে পারেন।

- ক্যান্সার, স্ট্রোক এবং অন্যান্য ঝুঁকি এড়াতে বছরে, অত্যন্ত: একবার রুটিন চেকআপ, ভেক্সিন ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এ সময় পান-জর্দ্দার অভ্যাস যাদের রয়েছে-মাড়ির ক্যান্সার এড়াতে তাদের নিয়মিত ডেন্টিস্ট এর চেকআপ এ থাকা উচিত এবং এসব পরিহার করাটাই বাঞ্চনীয়। নিজে নিজে গোসলের সময় স্তন পরীক্ষা করতে হবে, কোন প্রকার সন্দেহ হলে দেরি না করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যাদের জরায়ু নিচের দিকে বের হয়ে যাচ্ছে কিংবা প্রসাব ঝরে তাদের যত দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। এছাড়া ভারী জিনিস, শিশুদের-কোলে উঠানো, সিঁড়ি বাওয়া, জোরে হাঁচি-কাশি দেয়া, ঝাঁকুনি যুক্ত রাস্তা পরিহার করা উচিত। ওজন টাও নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্চনীয়।

বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি মানুষ-শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই রয়েছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। বিশ্বমন্দা, যুদ্ধ, বিভিন্ন রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাব, ভেজাল খাদ্য সব মিলিয়ে বিরাজ করছে চরম অস্থিরতা। এর মধ্যেই সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে কয়েকটি বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন: প্রতিটি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সঠিক বয়সে সঠিক ভেক্সিনেসন বা টিকা নিশ্চিত করতে হবে। শাক-সবজি, ফলমূল ও হালাল বা অর্গানিক খাদ্যাভাস গড়ে তোলা জরুরী। যতপ্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে তা থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা উচিত। পড়াশুনা, ব্যস্ততা, চাকুরীর চাপ যতই থাকুন-না কেন নিজের জন্য দিনে অত্যন্ত ৪০মিনিট শরীর চর্চার জন্য বের করে নিতে হবে।

গর্ভকালীন জটিলতা এড়াতে নারীদের উচিত প্রাথমিক অবস্থায়, পরিবারের যদি কারো জেনেটিক সমস্যা কিংবা হরমোন জনিত সমস্যা থাকে (যেমন মা, দাদীর) সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ একজন সুস্থ কিশোরী মানে একজন সুস্থ মা-একজন সুস্থ মা মানে একাধিক সুস্থ সন্তান-একটি সুস্থ পরিবার-একটি সুস্থ সমাজ॥

দুই ইটের উপর দাঁড়িয়ে মতিঝিল থেকে নিউ ইয়র্ক যাত্রা

অসীম বেনেডিক্ট পামার

দিন যায় তবুও কথা থেকে যায়, সময় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ, দিনটা ছিল ৫ সেপ্টেম্বর, বারটা ঠিক মনে পড়ছে না, সে দিনের বাণিজ্যিক এলাকা এখনো চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনো এক গোধূলি লগ্নে, দেশের স্বনামধন্য খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব খান আতাউর রহমানের শ্রুতি স্টুডিওর ছাদে বসে যথারীতি বন্ধুদের সাথে জমিয়ে আড্ডায় রত ছিলাম, সেদিনের বন্ধুদের মধ্যে নাম না বললেই নয় বিশেষ করে রুমা, সাগর, জাভেদ, অপু, শক্তি এবং শ্রুতি স্টুডিওর মালিকের ছেলে ঈমান উল্লেখযোগ্য।

আড্ডার সময় সর্বদা একটা বিষয় সামনে চলেই আসতো সেটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশ আমেরিকার কথা। বলাবাহুল্য, আমরা কমবেশী সবাই কিন্তু ভালো ছাত্র এবং ভালো কলেজ [নটরডেম, ঢাকা কলেজে] অধ্যয়নরত ছিলাম। সেই সময় কয়েকটা টিভি সিরিজ বেশ জনপ্রিয় ছিল তন্মধ্যে ডালাস এবং ডায়নেস্টি উল্লেখ করার মতো। খেলার ছলে, আড্ডার ছলে বাজি ধরা একটা যথারীতি অভ্যাস ছিল কিন্তু এই বাজি কোনো টাকা পয়সার বাজি ছিল না, ছিল কঠিন কিছু করে দেখানো, অসম্ভবকে সম্ভব করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

সেই সময় মার্কিন দূতাবাস ছিল মতিঝিল এলাকায় এবং লোকজন ওখান থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় সব কিছুই যেমন ভ্রমণ, বাণিজ্যিক কিংবা শিক্ষা সংক্রান্ত ভিসা পেয়ে থাকতেন। মনের মধ্যে একটা অভিপ্রায় বলেন কিংবা কৌতূহল বশত ইচ্ছা বলেন একটা চাওয়া বা পাবার জন্য কাজ করতো সেটা হলো, স্বপ্নের দেশ, স্বপ্নের ভিসা মার্কিন ভিসা। টিভি সিরিয়াল দেখেই সেই স্বপ্নটা যেন পেয়ে বসতো, কবে পদার্পণ করবো, নিজেকে আবিষ্কার করবো সশরীরে আমেরিকায়।

আড্ডায় অনেক বিষয় নিয়েই কথা হতো, কখনো বা খেলাধুলা নিয়ে কথা, কখনো বা পড়াশুনা বা কলেজের স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎই একদিন তর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম আমেরিকান ভিসা পওয়া না পাওয়া নিয়ে, আমি বরাবরই একটু একরোখা ও সরাসরি কথা বলা স্বভাবের লোক ছিলাম, যেহেতু আমি সদ্য সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল থেকে পাস করা ও নটরডেমে অধ্যয়নরত ছাত্র এবং বরাবর অন্য অনেকের চেয়ে ইংরেজিতে ভালো ছিলাম তাই একরকম আত্মবিশ্বাস কাজ করছিলো মার্কিন ভিসা পাবার ব্যাপারে।

আমার কোন এক বন্ধুর প্ররোচনায় কিংবা উৎসাহিত করার নিমিত্তে আমেরিকার ভিসা পাবার সামর্থের ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো এবং এই প্রস্তাবনা অনেকটা চ্যালেঞ্জের আকারে গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হলাম। যেই কথা সেই কাজ, শর্ত আরোপ করা হলো ভিসা পেলে কোরবানির আকারে গরু জবাই করা হবে। আমি বেশ দৃঢ়তার সাথে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রেখে মার্কিন দূতাবাসে ভিসার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে সচেষ্ট হলাম। বলাবাহুল্য, মার্কিন ভিসার জন্য যে বাধ্যবাধকতা মূলক যোগ্যতা বা শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল টোফেল [TOEFL] বা স্যাট [SAT] এর ৯০% ফলাফলের কাগজ নিয়ে ভিসার জন্য আবেদনে উত্তীর্ণ হওয়া। আমি একটু গর্বের সাথে বলতেই পারি TOEFL এ ৯০% এর উপর ফলাফল নিয়ে সার্থকতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। ৩০ বছরেরও একটু আগে নটরডেম কলেজে TOEFL ও SAT পরীক্ষা হতো।

ছমাস পর যথারীতি মার্কিন দূতাবাসে সমস্ত কাগজপত্র সাথে নিয়ে খোদার নামে হাজির হয়ে গেলাম। তীব্র অনুশোচনা ও পাশাপাশি ভয়ও কাজ করছিলো, কারণ নিজের একটা নীতিগত আদর্শ নিয়ে কথা। পাসপোর্ট সহ সকল কাগজ পত্র দূতাবাসে জমা দিলাম, কাউন্টার থেকে বলা হলো বিকেল ৩ তার পরে আসার জন্য। আমাকে একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেছিল যা ছিল, তুমি তো ওখানে গিয়ে আর আসবে না, প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম যদি তোমার দেশ আমার দেশের চেয়ে ভালো হয় তবে আমি অবশ্যই আসবো না। কাউন্টারে যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন বেশ রাগান্বিত হচ্ছিলেন। যাইহোক, আমাকে বিকেল ৩ টার পরে আসতে বলল। সে সময় বিকেল ৩ তার পর মানে ভিসা প্রদান। স্বপ্ন দেখার উৎসাহ বেশ কাজ করছিলো এবং ভিসাটা হাতে নিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেকে গর্বের সাথে উত্থাপন করলাম। বেশ কয়েকদিন পর শর্তানুযায়ী কাজটি সম্পাদন করা হলো।

দিনটি ছিল জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ, পৃথিবীর দ্বিতীয় রাজধানী বলে খ্যাত নিউইয়র্ক এর উদ্দেশে [TWA] ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্স চরে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত বিমানবন্দর [JFK] জন এফ কেনেডি রওনা হলাম, যখন পৌঁছালাম তখন মনে হলো আমি দক্ষিণ মেরুতে আছি, স্নো স্টর্ম বা বরফ ঝড় সম্বন্ধে মোটেও ধারণা ছিল না যা কিনা আমার জীবন যুদ্ধের এক বিরল অভিজ্ঞতা বলা যায়। স্বপ্নের আশা পূরণ হলো ঠিকই কিন্তু জীবনের ওয়ান ওয়ে রাস্তায় নিজেকে সম্পৃক্ত করলাম, জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো, যা অবিসংবাদিত সত্য॥

ইউরোপ ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা

জেম্‌স গমেজ (আদি)

গত জুলাই মাসের ১৬ থেকে ২৬ পর্যন্ত ইউরোপে তীর্থ যাত্রা করতে গিয়েছিলাম। আমেরিকার স্থানীয় মণ্ডলীর একমাত্র বাঙালি ফাদার, স্ট্যানলী গমেজের (আদি)র ব্যবস্থাপনায় এ তীর্থ যাত্রা সম্পন্ন হয়। আমেররিকার বিভিন্ন স্টেটস থেকে ১৬ জন এ তীর্থযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। ইউরোপের পাঁচটি দেশে যথাক্রমে চেক্-রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া ও জার্মানী দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তৎকালীন রাজা-রাণীর রাজ প্রাসাদে, সকল দেশের রাজধানীর পুরাতন ও নতুন শহর পরিদর্শন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবিশেষ গির্জা ও বিল্ডিং এবং ইহুদীদের যে স্থানে অত্যাচার ও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করো হয়। সেই সাথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা হয়।

ইউরোপের এ তীর্থ হবার কথা ছিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু মহামারি করোনার কারণে তীর্থ বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে ইউরোপের অনুমোদনে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তীর্থ শুরু হয়। এ তীর্থের এক গুরুত্বপূর্ণ মূলসুর ছিল জার্মান দেশে বিশ্ব-বিখ্যাত যিশুর যাতনা ভোগের প্লে শো। প্রতি দশ বৎসর পর পর এ সোটি হয়ে থাকে, সে জন্য ফাদার স্ট্যানলী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের এ তীর্থের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু করোনা'র কারণে বাতিল হয়ে যাবার পর এ বৎসর তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হয়। বিশ্ব বিখ্যাত এ প্লে শোটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি এ লেখাতে বিবরণ দেব।

ইউরোপের তীর্থযাত্রায় অংশ নেবার পেছনে আমার পরিবারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। প্রথমত আমাদের বিবাহিত জীবনের পঁচিশতম জুবিলী এবং দ্বিতীয়ত আমাদের মেয়ে মোহনার কলেজ গ্র্যাজুয়েশন। সেই সাথে আমাদের ছেলে খ্রীষ্টফারের ২১ বছর পূর্ণ হলো। এ সব আনন্দের উৎস মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা ইউরোপের এ তীর্থ যাত্রায় অংশ নেবো। গত বৎসর বড়দিনে পর থেকেই ইউরোপে যাবার আনন্দের সে দিনটির অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম।

এরই মাঝে আমার উপর দিয়ে এক বিশাল বড় ঝড় বয়ে গিয়েছিল, যেটা ছিল কল্পনার বাইরে। এপ্রিল মাসের শুরুতে আমার হার্টের ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন আমাকে ওপেন হার্ট সারজারি করতে হবে শীঘ্রেই ডাক্তার ও আমার পরিবারের পরামর্শ অনুযায়ী ২৯ এপ্রিল আমার ওপেন হার্ট সার্জারি হলো। ভেবেছিলাম আমার বুঝি ইউরোপে তীর্থে যাওয়া হবেনা। এত বড় সার্জারির পর ডাক্তার অনুমতি দেবে কিনা? জাতি না বেশ চিন্তিত ছিলাম। সার্জারির পর হাতে মাত্র আড়াই মাস সময় হার্ট রিকবারি হয়ে তো? প্রতিনিয়তই সৃষ্টিকর্তার কাছে ও আমার স্বর্গীয়া মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। খাবার সব কিছু মেপে খেতাম এবং যথারীতি স্বাস্থ্যের যত্ন নিতাম, ব্যায়াম করতাম। কাজেই আমার রিকভারিটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়েছিল। ডাক্তারের অনুমতি পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হলাম তীর্থে যেতে পারব বলে।

ছবি - লেখক

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে ইউরোপে তীর্থে যাবার দিনটি এসে পড়ল। ১৬ জুলাই নিউইয়র্কের কেনেডী এয়ারপোর্ট থেকে জার্মানীর লুফতহানসা প্লেনে করে উড়ে যাই ইউরোপের উদ্দেশে। প্রথম দেশটি ছিল চেক্-রিপাবলিক।

প্রাগ, চেক্-রিপাবলিক: প্রাগ হচ্ছে চেক্-রিপাবলিক দেশের রাজধানী। খুবই সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এ শহর। তাই প্রাগকে বলা হয় ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর রাজধানী। প্রাগের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে Vlava নদী আর এ নদী প্রাগের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রাগ এয়ারপোর্টে পৌছালেই আমাদের তীর্থ দলকে স্বাগত জানালেন টুর গাইড খ্রিস্টভক্ত। তিনি জার্মান এবং কাথলিক। তিনি আমাদের বিশাল বাসে করে নিয়ে গেলেন হোটেলে। রাতের খাবারের পর খ্রিস্টভক্ত আমাদের নিয়ে গেলেন Metro করে old city তে। আবহাওয়া ভাল ছিল, কাজেই প্রচুর মানুষের আনাগোনা প্রথম সন্ধ্যা খুবই আনন্দময় ছিল।

পরেরদিন সকালে প্রাগ শহরে প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম আওয়ার লেডী অফ ভিক্টরী চার্চে সেখানে বিশাল বড় শিশুযিশুর মূর্তি রয়েছে। এরপর গিয়েছিলাম ১০০০ বৎসরের পুরাতন ইতিহাসের Hradcany রাজ-প্রাসাদে, যেখানে চেক্ দেশের বিভিন্ন রাজা ও রাণী বাস করতেন। এরপর St. Vitus ক্যাথিড্রালে এবং St. George বেসিলিকাতে পরিদর্শন করি। হাজার বৎসরের পুরাতন বিল্ডিং ও গির্জা গুলো দেখে মনে হচ্ছিল এখনো কত শক্ত এ অট্টালিকাগুলো। এরপর যাই Old Town এর পুরাতন ঐতিহাসিক Town Hall সেখানে আছে Animated Astronomical Clock. Town Hall বিল্ডিং এর উপর দিকটাতে এ বিশাল ঘড়িটা আছে যা ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে বানানো হয়। প্রতি ঘন্টায় টুরিষ্টগণ জড়ো হয় এ ঘড়ির ঘন্টা শোনার জন্য এবং ঘন্টার আওয়াজের সাথে সাথে Animate গুলো বের হয়। এটি দেখার জন্য শতশত মানুষ এক সাথে Town Hall এ জড়ো হয়ে উপভোগ করে।

ব্রাটিস্‌লাভা, স্লোভাকিয়া: ব্রাটিস্‌লাভা হলো স্লোভাকিয়ার রাজধানী। ব্রাটিসলাভা শহরটি খুব সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। Carpathian Mounta এর পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবুজের পর সবুজ মনকে আটকিয়ে ফেলেছে। ঐতিহাসিক Gothic Cathedral of St. Mart এ পরিদর্শন করি। সব গির্জাগুলোর কারুকার্য দেখার মত, প্রশ্ন জাগে সে আমলে কিভাবে নির্মাণ করেছে।

বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরী: বুদাপেস্ট হলো হাঙ্গেরীর রাজধানী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। বুদাপেস্ট শহরকে বলা হয় ইস্টার্ন ইউরোপের Cosmopolitan শহর। বুদাপেস্ট শহরকেও বলা হয় Queen of Danub Danube নদী ইউরোপের দ্বিতীয় লম্বা নদী। বুদ ও পেস্ট দুটি শহরের সংযুক্তে হলো বুদাপেস্ট। বিখ্যাত নদী Danube র ডান পার্শ্বে মডার্ণ শহর গড়ে উঠেছে পেস্ট Danube নদীর দু-পার্শ্বে বুদা ও পেস্টে যাতায়াতের জন্য রয়েছে সাতটি ব্রিজ।

Heroes Square খুবই গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। যুদ্ধে জয় লাভ করার পর যে সাতজন মহা সৈনিক ছিলেন তাদের স্মৃতি ও সম্মানে বিশাল আকারের মুর্তি রাখা হয়েছে এ Heroes Square এরপর যাই প্রাচীন শহর বুদা এখানে প্রাচীন কালের প্রাসাদগুলো পরিদর্শন এবং Gillert HIll। থেকে পুরো শহরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করি। সেই সাথে প্রাচীন কালের গির্জা গুলোতেও পরিদর্শন করা হয়।

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া: ভিয়োনা হলো অস্ট্রিয়ার রাজধানী। আমরা প্রতিটা দেশে বাসে করে যাতায়াত করেছি। বাসে থেকে সবুজে সবুজে

ঢাকা অস্ট্রিয়ার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুভব করেছি। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে আমরা ছিলাম। ভিয়েনাকে বলা হয় Legendary এবং Classical music এর শহর। ভিয়েনা Operaর জন্য বিখ্যাত। সকালে আমরা পরিদর্শন করতে যাই Prince Eugene's Belvedere Palace। এ বাগানে এত ফুলগাছ যা দেখে মনে হলো স্বর্গের দ্বারে এসেছি। মন ভরে গেল বাগানের ফুল দেখে আর উপভোগ করলাম সুগন্ধিকে।

ভিয়েনাতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানে গিয়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে Emperor Franz Josef's Hofburg Palace, The Burg Theater, State Opera House, Votive Church Ges Historic Schonbrunn Palace, এ প্যালেসে আছে ১৪০০ রুম, হল, মিউজিয়াম।

ভিয়েনাতে Austrian King Queen's Chaple At The Schon Brunn, এ চ্যাপেলে তৎকালীন শুধু রাজা-রাণী ও রাজ পরিবার খ্রিস্টযাগ শোনতেন। আমার ও আমার স্ত্রী সুইটির জন্য এক মহা সৌভাগ্য হয়েছিল এ চ্যাপেলে খাবার। পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী ফাদার স্ট্যানলী আমাদের বিবাহিত জীবনের ২৫ বৎসরের নবায়নের অনুষ্ঠান এ চ্যাপেলে সম্পন্ন করেন।

মিউনিক ও জার্মানী: অস্ট্রিয়া শেষ করে বিখ্যাত নদী Danube এর পার্শ্ব দিয়ে এবং মন ভরে উঠা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌছালাম মিউনিক, জার্মানীতে। মিউনিক অতি সুন্দর ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর। প্রতি বাড়িতে ফুল গাছ বপন করে, মনে হয় যেন ফুলের বাগানে ভরে আছে দেশটি জুড়ে। মিউনিকে পৌছাবার পূর্বে আমরা দুটি বিশেষ স্থানে পরিদর্শণ করি। প্রথমটি Marktl Am Inn ছোট্ট গ্রামে পোপ বেনেডিক্টের শৈশব কালের বাড়িতে এবং Home of The Black Mandonna of Altotting যেখানে বিগত ৫০০ বৎসর যাবৎ তীর্থ হচ্ছে। এরপর Shrine of our lady and the Basilica of St. Anna এ খ্রিস্টযাগে অংশ নেই।

মিউনিকে Mad King Ludwig's Fairytale Neuschwanstein Castle, Walt Disney Theme parks পরিদর্শন করি। Wittels Bacher এর রাজা ও ডুকস ৬৫০ বৎসরের বেশি রাজত্ব করে এ মিউনিকে এই রাজা ও ডুকসদের ফেলে যাওয়া বিশাল বড় প্রাসাদ ও আর্ট কালেকশন এখনোও রয়েছে।

এ তীর্থযাত্রার এক বিশেষ দিক ছিল মিউনিকের Oberammergau গ্রামে যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর The Passion Play of Oberammergau মঞ্চ নাটক। উল্লেখ্য এ শো প্রতি দশ বৎসর পর পর দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। মে মাস থেকে শুরু হয়ে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ হয়। পাঁচ দিনে পঁচিশ হাজার দর্শক শোটি উপভোগ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসেন। প্রথমে আড়াই ঘন্টা এর পর বিরতি তারপর শেষের আড়াই ঘন্টা সর্বমোট পাঁচ ঘন্টার এ অতুলনীয় শোতে প্রায় ৪০০ জন অভিনেতা নেত্রী ও দলীয় শিল্পী দ্বারা আয়োজিত। জীবন ধন্য করার মত এ শো।

ইউরোপের ইতিহাস বিশাল বড়। ইউরোপের রাজ প্রাসাদ ও গির্জার কারুকার্য অতুলনীয়, যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। ২০০ থেকে ১০০০ বৎসরের পুরাতন গির্জা ও বিল্ডিংগুলো সে আমলে কিভাবে তৈরি করেছে যা ভাবা অবিশ্বাস্য ইউরোপের সে অতুলনীয় সবুজ মনোরম দৃশ্য আজো তীর্থযাত্রীদের হৃদয়ে গেঁথে আছে।

তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে ১৬ জন তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও এক পরিবারের সদস্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেষদিন আমরা সকল তীর্থযাত্রীগণ ফাদার স্ট্যানলী গমেজ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, এত সুন্দর দেশগুলো দেখার সুযোগ করে দেয়ার সৌভাগ্য করার জন্য এবং টুর গাইড খ্রীষ্টকেও বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

২৬ জুলাই সকল তীর্থযাত্রী ইউরোপের বিশাল ভালবাসা নিয়ে Lufthansa জার্মানীর প্লেনে করে নিউইয়র্ক, আমেরিকাতে ফিরে আসি॥

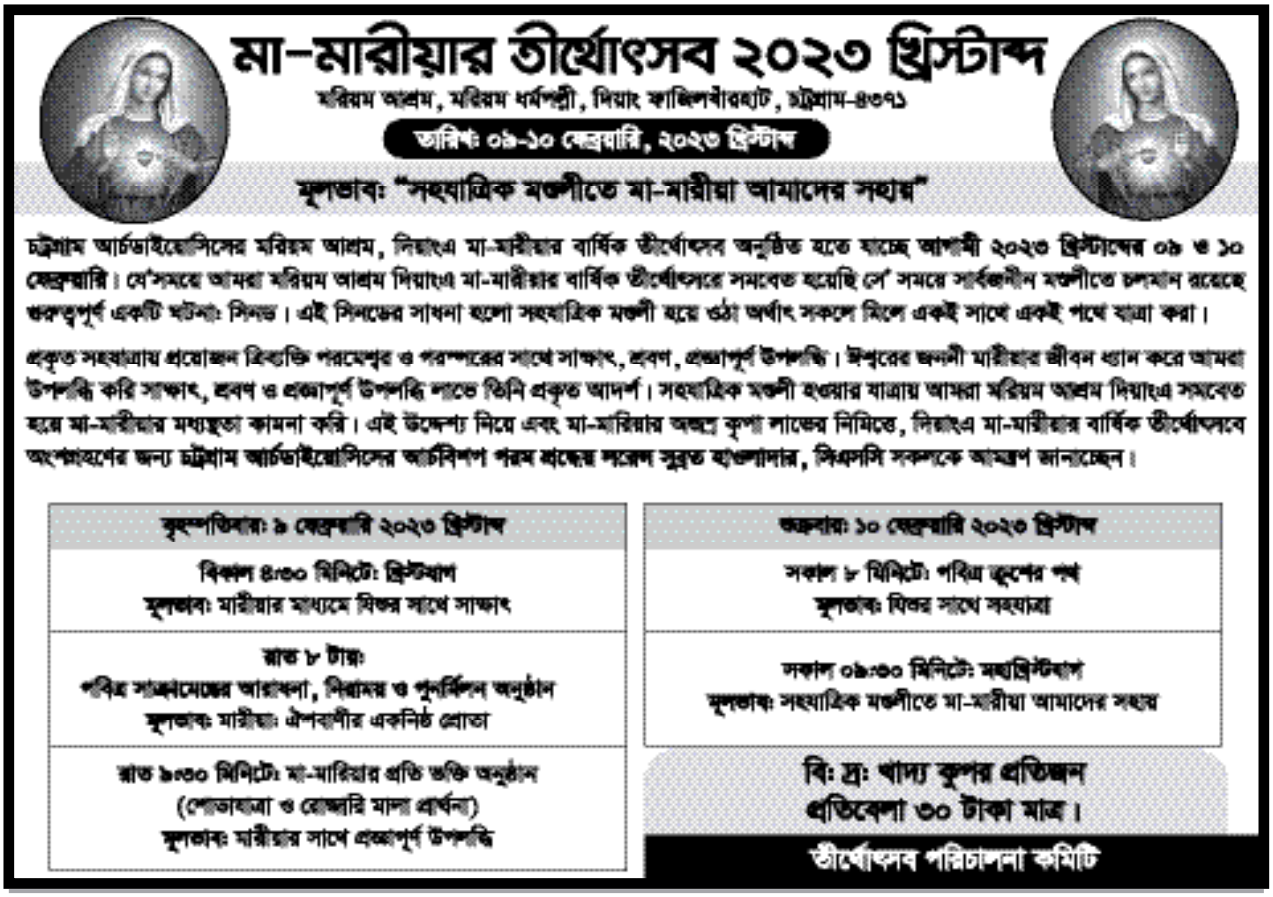

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টে কিছু সময় ঘোরাঘুরি

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

ইতালীতে প্রবাসকালে জীবন অতিবাহিত করার সুবাদে বিভিন্ন ছুটিতে ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হলেও হিটলারের দেশ হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত জার্মান যাওয়ার সুযোগ হচ্ছিল না। অবশেষে ২০১৪ সালে আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশ হতে বড়দিনের ছুটি কাটিয়ে কাতার এয়ারওয়েজে ইতালী ফেরার পথে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফ্লাইট বিলম্ব ও মিস হওয়ায় স্বপ্নের দেশ জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট শহর কিছু সময় ঘুরে দেখার সুযোগ হলো।

জার্মান ইউরোপের বড় এক দেশ। জার্মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিধর দেশ হিসাবে বিশ্বে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। জার্মানীর ১৬টি শহরের একটি শহর ফ্রাঙ্কফোর্ট শহর। ফ্রাঙ্কফোর্ট শহর জার্মানীর পঞ্চম বৃহত্তম শহর। ফাইন নদীর তীরে এই সুবিশাল শহর গড়ে উঠেছে সুবিশাল দালানে এবং প্রকৃতির সীমাহীন সুন্দর্য শহরকে করে তুলেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শহরের আয়তন ২৪৮ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা হলো মাত্র সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার। ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে রয়েছে অনেক ঐতিহ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার নিয়ন্ত্রনাধীন জার্মানীর অংশ হিসাবে আমেরিকার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো এই শহর হতে। জার্মানীর অর্থনীতির হাফ বলা হয়ে থাকে এই শহরকে। কারণ শহরে রয়েছে বড় বড় শিল্প কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, এয়ারপোর্ট, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাবার জন্য বড় আন্তর্জাতিক রেলষ্টেশন। এই শহর বিখ্যাত হলো, আইস হকি, বইমেলা, ঔষধ শিল্প, কৃষিপণ্য সামগ্রী ও বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।

আমি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বড়দিনের ছুটি আমার পরিবারের সাথে কাটিয়ে ১৫ জানুয়ারি প্রবাস জীবন ইতালীর উদ্দেশে কাতার এয়ারওয়েজে ফ্লাইট ধরার উদ্দেশে ঢাকা এয়ারপোর্টে এলাম। এয়ারপোটে লাগেজ বুকিং দেবার সময় মাইকে ঘোষণা হলো, আমরা ফ্লাইট ফ্লাই করবে নির্দিষ্ট সময়ের ৫ ঘন্টা পর। মনটা তখন বেশ খারাপ ছিলো এবং এই খবর শোনার পর আরো খারাপ হলো। অবশেষে রাত ১১টার ফ্লাইটে ঢাকা হতে কাতারের উদ্দেশে ফ্লাই করলো ভোর ৪টায়। কাতার এয়ারপোর্টে ট্রানজিটে নেমে জানলাম আমাদের ইতালীর ভেনিসের জন্য নির্দিষ্ট করা পূর্বের ফ্লাইট আমরা মিস করেছি তাই আমাদের ফ্লাই করতে হবে কাতার এয়ারের জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টের এয়ারপোর্টের ফ্লাইটে। তখন মনটা আনন্দে ভরে উঠলো জার্মানীর মাটি স্পর্শ করার প্রত্যাশায়।

কাতার এয়ারওয়েজের নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট ফ্লাইটে হিটলারের দেশ জার্মানীর পথে আমরা ফ্লাই করলাম। তখন নতুন দেশ দেখার স্বপ্নে বিভোর আমি। প্রায় ছয়ঘন্টা নীল আকাশপথ অতিক্রম করে ইউরোপের সময় বিকেল ৪টায় জার্মানীর বিখ্যাত ফ্রাঙ্কফোর্ট এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। কিন্তু এয়ারপোর্টে এসে জানতে পারলাম আমরা যে কয়জন ইতালীতে যাবো আমাদের এখান হতে ফ্লাইট ধরতে সময় লাগবে প্রায় দশ ঘন্টা পর তাই আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবে কয়েক ঘন্টা থাকার জন্য। এরই মধ্যে ফ্রাঙ্কফোর্ট বিমানবন্দর ঘুরে দেখার সুযোগ হলো। বিশাল বড় ও প্রাচীন এয়ারপোর্ট। একটু পরেই বাসে চড়ে বসলাম হোটেলের উদ্দেশে। আমরা এয়ারপোর্ট হতে কিছুদূরে অবস্থিত হোটেল 'লিওনার্দো রয়েল'তে উঠলাম। আমাদের বলে দেওয়া হলো আমরা হোটেলে থাকবো ৬ ঘন্টা এবং এর মধ্যে ইচ্ছে করলে নিজ দায়িত্বে কোথাও ঘুরতেও যেতে পারি অথবা নির্দিষ্ট রুমে বিশ্রাম নিতে পারি। আমরা এক রুমে ২ জন ছিলাম। আমার সাথে ছিলো শ্রীলঙ্কার বন্ধু জয়ন্ত কুমারা। আমরা পরিকল্পনা করলাম সুযোগ যখন হলো তা হলো ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরটা একটু ঘুরে দেখে আসি না!

আমরা হাত লাগেজ রুমে রেখে ফ্রেশ হলাম। তারপর হোটেলে ২ জনে কফি খেলাম এবং হোটেলের অভ্যর্থনা কেন্দ্র হতে শহরের গাইড সংগ্রহ করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফ্রাঙ্কফোর্ট শহর ঘুরে দেখতে বের হলাম। তখন জার্মানীর সময় বিকেল ৫টা। প্রচণ্ড শীত। দিন বেশ ছোট। তাই সূর্যটা অস্ত যাচ্ছিল। আমাদের ট্যাক্সি পথ চলতে শুরু করলো। বিশাল সুন্দর পীচঢালা পথ। পথের উভয় পাশে শুধু গাছ আর গাছ। রাস্তার পাশে অনেক দূরত্বে ছোট ছোট ভোলা বাড়ি গড়ে উঠেছে। বিশাল বিশাল জমিতে চাষ হয় আপেল, কমলা ও আঙ্গুর ফল। আর অদ্ভূত সুন্দর প্রকৃতির সীমাহীন সুন্দরতা মন কেড়ে নেয়। একটু দূরে দূরে গির্জা প্রার্থনা করতে স্মরণ করায়।

আমরা ট্যাক্সি করে চলে এলাম সেই বিখ্যাত ফাইন নদীর তীরে, ভীষণ সুন্দর নদী। একদম টলটলে নীল পানি। নদীর পাড়ে হাজার হাজার পর্যটকের মিলন মেলায় আমরাও মিলে একাকার হলাম। নদীরপাড় ঘুরে দেখলাম এবং এবার চলে এলাম ফাইন নদীতে অনেক সুন্দর কারুকার্যে তৈরি করা সেই বিখ্যাত ঝুলন্ত ব্রীজের ধারে। কি যে সুন্দর ব্রীজ তা বলে শেষ করার মতো নয়। ব্রীজের সুন্দরতায় মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। ব্রীজের ধারে একটা রেস্টুরেন্টে বসে ইউরোপের বিখ্যাত "পিজ্জা" খেলাম অনেক তৃপ্তি নিয়ে। হাতে সময় কম তাই বেশি দেরি না করে এবার আমাদের নির্দিষ্ট ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম সিটি ওয়েস্টের পথে।

সিটি ওয়েষ্ট ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। সেখানে যাওয়ার পথে দেখলাম রাস্তায় দু'পাশে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। বড় বড় অফিস আদালত, ব্যাঙ্ক ও বীমা অফিস। একদম ছিমছাম শহর। কোথাও কোন যানযট নেই। সবই ছবির মতো সুন্দর। মনে হলো হিটলার জার্মানীর জন্য যা করেছেন তা এক ইতিহাস। আমরা চলে এলাম সিটিওয়েষ্ট। শহরের প্রাণকেন্দ্র। এখানে এসে আমরা বিশ্ববিখ্যাত ফ্রাঙ্কফোর্ট রেলষ্টেশনে এলাম। সুবিশাল রেলষ্টেশন। ঘুরে দেখে মনে হলো আমাদের কমলাপুর রেলষ্টেশনের ১০টার সমান এই বিখ্যাত রেলষ্টেশন। প্রতিক্ষণে এখান হতে ছেড়ে যাচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের জন্য দুরন্ত বেগের ট্রেন। আর স্থানীয় যাতায়াতের জন্য ট্রেনের তো এরকম ছড়াছড়ি। রেলষ্টেশনে রয়েছে শপিংমল ও আন্তর্জাতিক মানের রেষ্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল মোটেল। আমরা একটা ম্যাগডোনালে ঢুকে কফি খেলাম।

এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি হাতে খুব বেশি একটা সময় নেই। তাই মন না চাইলেও একান্ত বাধ্য হয়েই ইতালীর বলোনিয়ার ফ্লাইট ধরতে ক্ষণিকের সময় জার্মানীর মাটি স্পর্শ করেও অল্প সময়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরের অনেক ঐতিহাসিক সুন্দরতা উপভোগ করে ও মনের স্মৃতির পাতায় গেঁথে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম আমাদের ফ্রাঙ্কফোর্টের নির্দিষ্ট করা হোটেলের পথ ধরে॥

Fida International Bangladesh

JOB VACANCY ANNOUNCEMENT

Fida International Bangladesh is a registered INGO working in Bangladesh since 2010. It is funded by the Fida International Finland. Our main goals and objectives are to work for the disadvantaged slum dwellers, financially poor and needy people in the field of health, education and economic sustainable development. Most of our activities are in urban based areas in Dhaka district, Bangladesh.

We would like to hire the following staff for the Fida International Bangladesh. Applications are invited from the qualified and experienced Bangladeshi citizen as follows:

Name of Post	Positions	Responsibilities	Qualifications	Experiences	Age Limit
IT & Liaison Manager (Male)	01	Teaching computer, work on IT issues and doing others jobs as the Liaison Manager	Diploma/BSc in Computer Science/Information Technology. Professional certificate on IT related course.	5 Years working experiences	25-35 years
Female English Medium Teacher (For the SIS)	02	Teaching Play to Grade Five	'A' Level Passed or English Hon. Degree and also knowledge in MS Office, Excel & Power Point.	3-5 years Eng. Medium School Teaching Experiences	25-35 years

Interested IT & Liaison Manager hereby requested to submit his application along with their CV on or before the **15th February 2023** and Female English Medium Teacher (For the SIS) hereby requested to submit her application on or before **15th January 2023.**

Please apply with your recent Passport size photograph, National ID's photocopy, Mobile Phone number. Please write the position's name on the top of the envelope.

Please note that Fida International Bangladesh and SIS (Salmela International School) authority retains the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.

Mail your application to:
The Executive Director
Fida International Bangladesh
346 East Padardia
Satarkul Road, North Badda,
Dhaka -2941, BANGLADESH

Dated: 30.11.2022

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও আনন্দ। খ্রিস্টের আগমনে ভরে উঠুক শান্তিময় জীবন।

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে -

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

'নীড়' রিসোর্ট কাম ট্রেনিং সেন্টার
(জানুয়ারি-২০২৩ হতে বুকিং কার্যক্রম শুরু)

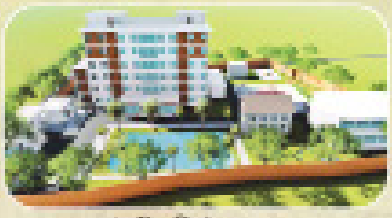

'শান্তির নীড়' বৃদ্ধাশ্রম
(জানুয়ারি-২০২৩ হতে বুকিং কার্যক্রম শুরু)

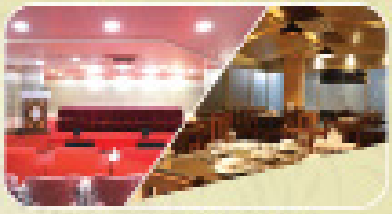

অডিটোরিয়াম এবং ক্যান্টিন
(বুকিং কার্যক্রম চলমান)

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

স্থায়ী আমানত
৬ ১/২ বছরে দ্বিগুণ

৫ বছর	৪ বছর	৩ বছর	২ বছর	১ বছর	৬ মাস	৩ মাস
১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%	৮.০০%	৭.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এলটি
৬.০০%	৫.০০%

+ ৬ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লাখ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক [illegible] টাকা হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। মুনাফার হার [illegible]।
+ ৫ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লাখ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক [illegible] টাকা হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। মুনাফার হার [illegible]।
+ ৩ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লাখ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর [illegible] টাকা হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। মুনাফার হার [illegible]।
+ ৫ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লাখ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর [illegible] টাকা হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। মুনাফার হার [illegible]।

শর্ট টার্ম এইচ.ডি.পি.এস.

এক বছর		দুই বছর		তিন বছর	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Deposits Amount	Total Benefit	Total Amount
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Regd. No. 282 Dated 06.06.0978

[illegible] info@mcchsl.org www.mcchsl.org

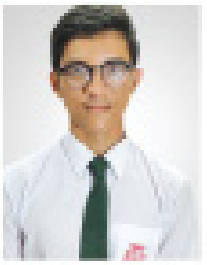

S.F.X. GREENHERALD
INTERNATIONAL SCHOOL
50 YEARS
GOLDEN JUBILEE
2022
Outstanding Cambridge Learner Awards, Bangladesh
Cambridge O Level
Top in Bangladesh
Adrita Zaima Islam
Cambridge O Level
High Achievement
Prathom Mitra
Cambridge International AS Level
Top in Bangladesh
Subject : Biology
Maung Thein Nyunt
Cambridge International A Level
Top in Bangladesh
Subject : Physics
Zuhayer Bin Noman
Merry Christmas
& Happy New Year 2023
Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School
24, Asad Avenue, Mohammadpur Dhaka - 1207
info@sfxghis.school
www.sfxghis.school

Wishing You All Merry Christmas & Happy New Year

সকলকে পুণ্যময় বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Bangladesh Christian Association, Australia (BCAA) Inc.

বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন, অস্ট্রেলিয়া (বিসিএএ) ইন্‌ক

Reg INC 9894894 Email: Info.bcaa@yahoo.com.au; Facebook: https://www.facebook.com/Info.bcaa

EXECUTIVE COMMITTEE 2022-2024

JEWEL PALMER
PRESIDENT

ANUP GOMES
VICE PRESIDENT

AKASH GOMES
GENERAL SECRETARY

EVANS GOMES
ASST G. SECRETARY

AMIT GOMES
TREASURER

RAKESH PALMA
CULTURAL SECRETARY

LARINA ROZARIO
ASST. CULTURAL SECRETARY

ANTHONY GOMES
RELIGIOUS SECRETARY

KOLLOL GOMES
EDUCATION & PUBLICATION

LORETTA FRASER
WOMEN & CHILDREN AFFAIR

SUDHON CRUZE
ORGANISING SECRETARY

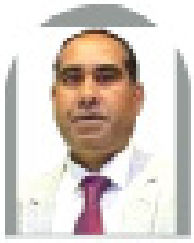
ASHT GOMES
ENTERTAINMENT SECRETARY

NEIL ROZARIO
SPORTS SECRETARY

ASHIS REBEIRO
EXECUTIVE MEMBER

JOY ROZARIO
EXECUTIVE MEMBER

ADVISORY PANEL

FR. YACUB BARKAT
SPIRITUAL ADVISOR

JOSEPH GOMES

JEROME D'ROZARIO

DILIP ROZARIO

SWAPAN COSTA

GERALD GOMES

VINCENT ROZARIO

THEOPHIL ROZARIO

SHAHOL GOMES

SUJIT GOMES

বাবা-মা তোমাদের স্মৃতি অমলিন

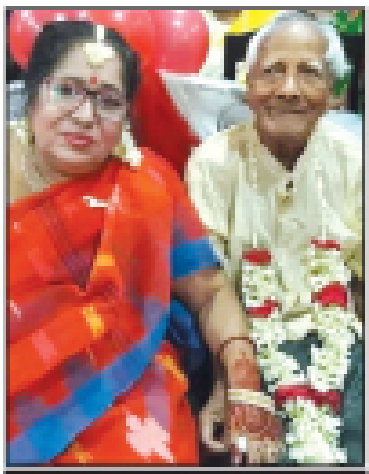

বাবা: ইলারিয়াস রোজারিও
জন্ম: ১৯ মে, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মা: বেলা মেরী সেসিলিয়া রোজারিও
জন্ম: ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

একটি বছরের ব্যবধানে তোমরা সন্তানদের এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ রেখে চলে গেলে স্বর্গলোকে; তবু তোমাদের স্মৃতি অমলিন। যে তরণীখানি ভাসিয়েছিলে দু'জনে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আজ তা সপ্ত সন্তানে ভরিয়ে রেখে তোমরা সংসার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পরমপিতার বক্ষে আশ্রয় নিলে পরম শান্তিতে। রেখে গেলে শোকাহত সন্তান-সন্ততিদের। তোমরা যে অপরিমেয় প্রেম ভালোবাসা-যত্নে গড়ে তুলেছিলে আমাদের খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধে, সহনশীলতা এবং মানবিকতায় তা স্মরণীয়।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর এক আদর্শ পরিবার গঠন করে ইতিহাস গঠন করে গেছো। তেজগাঁওয়ের স্থানীয় পরিবার থেকে যিশুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিচর্যায় দান করলে দুই সন্তানকে। অন্যদের গঠন করলে যোগ্যরূপে। এই ঢাকা নগরীর কণ্টকবিক্ষুব্ধ জীবনে কখনোই সহজ ছিলো না সাত সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্যরূপে গড়ে তোলার। কত সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অভাব, যুদ্ধ ও অরাজকতা পেরিয়ে তোমরা পরম ভালোবাসায় আমাদের আবৃত রেখে সন্তানদের নিরাপদে রেখেছো সেজন্যে কোনো কৃতজ্ঞতার ভাষাই যথেষ্ট নয়। তোমাদের স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধায়। নাজারেথের যিশু-মারীয়া-যোসেফের পুণ্য পরিবারের আদর্শে আমাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছো নিবিড় ভালোবাসায় তা অতুলনীয়। স্বর্গ থেকে আমাদের প্রতি বর্ষণ করো আশীর্বাদের অমিয়ধারা।

'আজ এসো মা এসে দেখো মা, মোদের কান্না'

বেলা মেরী সেসিলিয়া রোজারিও'র জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর এক ধার্মিক পরিবারে। পিতা জর্জ গমেজ এবং মাতা বীতা কস্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা তিনি। এই আদর্শ পরিবার থেকেই এসেছেন কাদার জ্যোতি অ্যালেক্সুস গমেজ এর মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যাজক যিনি খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক এবং বাণীদীপ্তির স্বর্ণালী যুগের পুরোধা ছিলেন তিনি। দুই বোন সিস্টার মেরী মিমিকা এবং সিস্টার রুটিকা স্মৃতি গমেজ। তেজগাঁও ধর্মপল্লীর ইলারিয়াস রোজারিও'র সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। বিবাহের পরপরই নব পরিণীতা বেলা ৬২'র দাঙ্গায় প্রতিবেশী পাল সম্প্রদায়ের অনেককে আশ্রয় দিয়ে মা মারীয়ার অপার কৃপায় প্রাণরক্ষা করেন। ঘটনাবহুল জীবনে তিনি পাড়ায় প্রার্থনা দল গঠন করে নিয়মিত ঘরে ঘরে প্রার্থনা এবং মে মাসে মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে পাড়ায় শোভাযাত্রার প্রচলন করেছিলেন। তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে কিরণ গমেজের নেতৃত্বে মারীয়ার সেনা সংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯৮ থেকে আমৃত্যু এর সভাপতি ছিলেন। ঢাকা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের 'রত্নগর্ভা জননী' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তাঁর প্রার্থনাশীল জীবনের ফলস্বরূপ দুই সন্তানকে মণ্ডলীকে দান করেছেন এবং অন্য সন্তানদের শিক্ষা-মানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

সুমন পিরিজ

জন্ম: ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দাদা, কত দ্রুত বয়ে যায় সময়! বড় অসময়ে চলে গেলে তুমি–তোমার অকাল প্রয়াণ আমাদের ভাসিয়ে গেলো শোকের সাগরে। জানি, তুমি আছো পরম পিতার আশ্রয়ে, তবু সান্ত্বনা মানে না আমাদের মন। কত স্নেহ-মমতায় তুমি পালন করেছো আমাদের তা ভাষায় কিভাবে প্রকাশ করব বলো! বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই তুমি চলে গেলে সংসার সমুদ্রে আমাদের রেখে। আমাদের কোনো আকুতি, প্রাণান্তকর চেষ্টাই তোমাকে ফেরাতে পারেনি। তুমি চলে গেলে–রেখে গেলে ভালোবাসা, যত্ন ও প্রেমময় ব্যবহার। সবার সঙ্গে তোমার প্রেমময় ব্যবহার, সমবয় আমাদের মনে আনে বেদনার মাঝে আনন্দের স্রোতধারা। স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো, যেনো আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদর্শে পরিবার গড়ে তুলতে পারি। তোমার নির্মল হাসি, তোমার প্রেমময় স্মৃতি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোকার্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...

প্রয়াত জর্জ হেবল ডি'ক্রুজ

জন্ম: ৬ নভেম্বর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল দুইটি বছর, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো স্বর্গীয় পিতার কাছে। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি তবুও তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে। আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবো না কোনদিন। তুমি আজও বেঁচে আছ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শে পথ চলতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে
রেখা লুসি ডি'ক্রুজ এবং
আইরিন, রোজলীন, এডলিন, মেরীলিন, তাপস, সোমা ও অপু।

"স্বর্গধামে অনন্ত যাত্রা"

প্রয়াত এলিজাবেথ গমেজ (রানু)
জন্ম: ২০ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত গ্রেগরী গমেজ
জন্ম: ১৯ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ জুলাই, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রভু যাকে তুমি ভালবেসেছো, অসময়ে তোমার বশ
তাই গেয়েছে জয় গানে, তোমার স্মরণে তোমারি কীর্তি চরণে
নিজেকে করেছেন সমর্পণ।

আমাদের মা এলিজাবেথ গমেজ (রানু) বিগত ১১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গধামের অনন্ত যাত্রার পথ প্রভু দেখিয়ে দিয়েছেন, জীবন লীলা সাঙ্গ হলো এ মর্ত্যভূমিতে। সারাজীবন সে নিজেকে প্রার্থনায় সাজিয়ে রেখেছেন, প্রিয়জনদের দেখিয়েছেন সত্যের আলো। ছোট বড় সকলকে স্নেহভরা ভালবাসা দিয়ে হৃদয়কে করেছেন প্রশান্তির ফোয়ারায় আচ্ছাদিত, আজ পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে তাঁর সময় একা করে চলে গেলে অনন্তের মাঝে। চোখের আড়ালে চলে গেছো কিন্তু রয়েছ সবার হৃদয় জুড়ে। সেই স্মৃতির পাতায় অম্লান তোমার হাসি মাখা উজ্জ্বল মুখের কথা, ভালবাসার সব সৃষ্ট কীর্তিগাথা, শিক্ষকতাকর্ম অবদান, বিশেষ করে ঢাকার তেজগাঁও খ্রিস্টমণ্ডলীর কাছে আজীবন চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মা ০৩/০১/১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও তুমিলিয়া বাড়ির বাবা গ্রেগরী গমেজ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, পরবর্তীতে তারা দু'জনে ঢাকার তেজগাঁও খ্রিস্টমণ্ডলী গঠনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন, নিজ বাসায় নিয়মিত প্রার্থনা খ্রিস্টযাগসহ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে প্রচার করা এ সবই খ্রিস্টীয় আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। তেজগাঁওয়ে সেন্ট লরেন্স গির্জা ও সেন্ট জিনসেন্ট ডি'পলস স্কুল প্রতিষ্ঠায় আমাদের বাবা ও মায়ের বিশেষ অবদান রয়েছে। আমাদের বাবা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া সামাজিকভাবে তিনি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য অনেক সেবাকাজ করে গেছেন।

আমাদের মা অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে বিশেষ প্রার্থনা, সহভাগিতা, পরিবারের প্রতি সহমর্মিতাসহ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সবাইকে পরিবারের পক্ষথেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের বাবা মায়ের আত্মার স্মরণে প্রার্থনা করবেন, প্রেমময় ঈশ্বর যেন তাদের আত্মার চিরশান্তি দান করেন। তোমরা দুজনে আমাদের আলোক-জ্যোতি। মহাশান্তির মাঝে নিভৃত হয়ে গেলে আপন আলোক বিসর্জন দিয়ে, প্রণাম তোমাদের প্রণাম।

শোকার্ত ও কৃতজ্ঞতায়
বড় ছেলে : পংক্রেজ আগস্টিন, ছোট ছেলে : ফাবেনিয়ান আগস্টিন, মেয়ে : মার্কলীন আগস্টিন,
বড় ছেলের স্ত্রী : এলিনা আগস্টিন, ছোট ছেলের স্ত্রী : ভিক্টোরিয়া আগস্টিন,
নাতি : প্রভাতী আগস্টিন, নাতনী : আফরীন আগস্টিন
বি সি সি ৫৩৮, উত্তর তেজকুনী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

হৃদয়ে তোমরা অমর

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : নদীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত শিশিলিয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : নদীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত বেনজামিন রোজারিও
জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : নদীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : নেওল, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত ইউফ্রেজী রেনু রোজারিও
জন্ম : ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : নদীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

কালের আবর্তে দেখতে দেখতে ৮টি বছর পেরিয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে হারিয়ে গেলে সেই অনন্তের অসীম নীলিমায়। কিন্তু তোমাদের অনিন্দ সুন্দর সদাহাস্য মুখগুলো অফুরন্ত ভালবাসা, কতশত সুখময় স্মৃতি, তোমাদের জীবন আদর্শ আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান থেকে তোমাদের শূন্যতা ও অভাবকে একটি পুরোপুরি সম্পূর্ণতা দিয়ে ভরে রেখেছে এবং অনুপ্রাণিত করছে অকুতোভয়ে জীবন পথে চলতে এ অবর্ণনীয় এক সুখময় বেদনার অনুভূতি।

তোমরা তো আমাদের হৃদয়আকাশে তারা হয়ে নিত্য দীপ্তিমান। তোমাদের কি ভোলা যায়?

আমরা বিশ্বাস করি ও প্রার্থনা করি যে তোমরা ঈশ্বরের বাগানে সেরা ফুল হয়ে তার একান্ত সান্নিধ্যে পরম আনন্দে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাদের আদর্শে সর্বদা মিলে-মিশে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করে জীবন শেষে তোমাদের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
শান্তিভবন
নেওল, নিউ জার্সি, আমেরিকা।

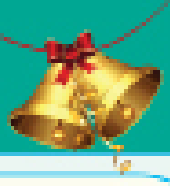

প্রয়াত পিটার গমেজ
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : কাঠীর বাড়ি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : জার্সি সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত আইরিন গমেজ
জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Until We Meet Again, Irene and Peter Gomes

Those special memories of you
will always bring a smile
If only we could have you back
for just a little while
Then we could sit and talk again
just like we used to do
you always meant so very much
and always will do too
The fact that you're no longer here
will always cause us pain
but you're forever in our hearts
until we meet again

With love,
Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa and Christopher

যখন আবার হবে দেখা

তোমাদের সেই বিশেষ স্মৃতিগুলো
সর্বদা নিয়ে আসবে আনন্দ বয়ে
যদি পেতাম তোমাদেরকে কাছে
শুধু ক্ষণিকের তরে
তখন বসে আবারও গল্পগুজব করতাম
যেমন করতাম ঠিক আগের মত।
তোমরা যে সর্বদা ছিলে আমাদের কাছে
অনেক প্রিয় এবং থাকবেও তাই
প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে আমাদের কাছে আর নেই
এটা ভেবে আমাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়
কিন্তু তোমরা তো আছ সর্বদা আমাদের সাথে
যে পর্যন্ত না আবার দেখা হবে।
তোমাদেরই সন্তানেরা
ভেরোনিকা (শোভা), ম্যানুয়েল (বাবলু), এলিজাবেথ (মিতা)
তেরেজা (আরতি) ও খ্রীষ্টফার (টিপু)

স্মৃতিতে তুমি অমর

আন্তনী জীবন গমেজ
জন্ম : ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ১৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, আন্তনী জীবন গমেজ, এক স্নেহশীল পিতা, দাদু এবং এক প্রিয় মামা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।
আন্তনী গমেজের জন্ম হয় ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। তিনি ছিলেন লাজারুস ও লুসি গমেজের পাঁচ সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ। তিনি এলিজাবেথ লিওনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বর তাদেরকে দুইজন মেয়ে-জেইন লুসি এবং জুন আইরিন এবং একজন ছেলে-কেনেথ লাজারাস দিয়ে আশীর্বাদ করেন।
আন্তনী সৌদি আরবে কয়েক বছর কাজ করেন। পরে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর অভিবাসন নিয়ে সপরিবারে আমেরিকায় চলে আসেন এবং অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সির, জার্সি সিটিতে আজীবন বসবাস করেন। তিনি আরামার্ক কোম্পানীতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেন।
বড়দিনের সময় তিনি তার বিশিষ্ট কেক বানাতে এবং সেগুলো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিলাতে খুব ভালবাসতেন। বাংলাদেশের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে যেতে খুব পছন্দ করতেন এবং তাতে প্রচুর আনন্দ পেতেন।
আন্তনী ছিলেন একজন কর্মঠ, স্নেহশীল, সৎ, সাধারণ ও স্বল্পভাষী মানুষ কিন্তু স্বপ্ন ও প্রেমে ভরপুর। তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতা ও আদর্শ স্বামী। তিনি এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছেন যা কোনদিন পূরণীয় নয়।
আন্তনী গমেজ রেখে গেছেন তার স্ত্রী, তিন সন্তান, জামাতা, নাতি, ভাগ্নে-ভাগ্নি। আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব।
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : এলিজাবেথ গমেজ, মেয়ে : জেইন লুসি গমেজ, মেয়ে ও জামাতা : জুন আইরিন ও মহম্মদ আহমেদ, ছেলে : কেনেথ লাজারাস, নাতি : মার্স

In Loving Memory of Anthony Jibon Gomes

Anthony Jibon Gomes, a loving father, grandfather and a beloved uncle, passed away on Saturday, January 16, 2021, at the age of 69.
Anthony was born on March 28, 1951, in the district of Pabna, Bangladesh. He was the fourth of late Lazarus and Lucy Gomes' five children.
He married Elizabeth Leona on January 5, 1979. They raised two daughters- Jane Lucy and June Irene and a son - Kenneth Lazarus.
He worked in Saudi Arabia for several years. He then immigrated to the United States of America on October 8, 1988 and settled in Jersey City, New Jersey. He worked at Aramark till his retirement.
Anthony loved baking his signature cakes during Christmas and share them with the family, relatives and friends. He enjoyed visiting family and friends in Bangladesh and it filled him with great joy.
Anthony was very hardworking, loving, honest, simple and a man of few words but filled with dreams and love. He was a loving father and an ideal husband. He cared for the less fortunate and often donated. He has left a void that can never be filled.
Anthony is survived by his wife, three children, son-in-law, grandson, in-laws, nieces and nephews, his sister and hosts of friends.
May God grant Anthony eternal peace and happiness.

With live,
Elizabeth, Jane, June, Kenneth, Ahmed and Mars

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421

(Play Group to O' Level)

Dhaka Campus

Our Facilities

- Air Conditoned Classrooms.
- Secured With CCtv Camera.
- Wide playground.
- Use of Modern Teaching Metholodgy, Computer, Multimedia, Internet Etc.
- Special Care For Slow Learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Vehicle Available.

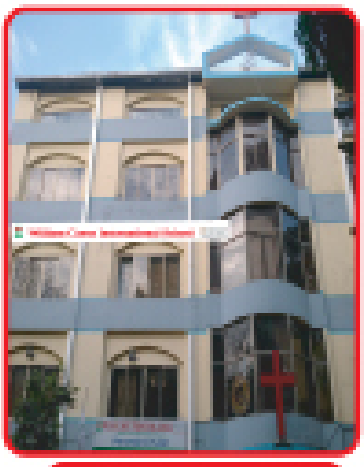

Savar Campus

You are welcome to visit the School Campus along with your kids

Admission Going on 2022-2023

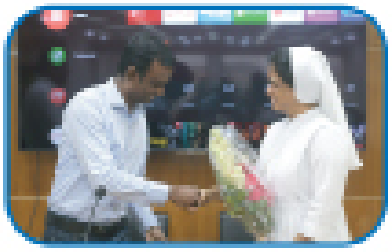

Teachers Training by Dr. Lipy Gloria Rozario

Science Fair Opening (Dhaka Campus)

William Carey Day ovserved

Teachers Training

Science Fair (Savar Campus)

United Nations Day ovserved

William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

Dhaka Campus: Bangladesh Baptist Church
70-B/1, Indira Road, (West Razabazar, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Contact: +88 02 222246708, 01989-283257

Savar Campus: YMCA International Building
B-1 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart it. Provers 22:6

এক সাথে পথ চলি

সুনীল পেরেরা

সুদীপের বাড়ি

[বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত সুদীপ ফোন করছে তার বন্ধু রবীনকে। ঘরে তার বৌ প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। গ্রামীণ ধাত্রী বাতাসী চেক করছে।]

সুদীপ : *হ্যালো-হ্যালো রবীণ, আমি সুদীপ বলতেছি। আমার-আমার বউ...*

রবীন : *আরে গাধা, আমার আমার করতাছস ক্যান। তর বউর কী অইছে?*

সুদীপ : *আমার বউ কেয়ার প্রসব বেদনা উঠেছে। অহন হাসপাতালে নিতে অইব।*

রবীন : *হাসপাতাল! অহন বাজে রাত বারোটা। আমি অহন গির্জায় কীর্তন দলে।*

সুদীপ : *তাইলে কেয়া.... তারে বাঁচাইতে না পারলে [হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে]*

রবীন : *আরে তুই কান্দস ক্যান? বিলের পাড়ে তগো বাড়ি, কোন রাস্তা ঘাট নাই। এই অবস্থায়... ঠিক আছে, আমি আইতাছি হ এক্ষণ আইতাছি।*

সুদীপ : *আইচ্ছা। [এ সময় বিষন্ন বদনে ঘর থেকে আসে বাতাসী।]*

সুদীপ : *কাকীমা, আপনের বৌমার কী অবস্থ? কথা কন না ক্যান কাকীমা?*

বাতাসী: *বাবা সুদীপ, তোমার বৌর পরথম ডেলিবারি অইব। তাই আমারে দিয়া ডেলিবারি করন ঠিক অইবনা।*

সুদীপ : *তাইলে।*

বাতাসী: *আমি গেরামের অশিক্ষিত, তেমুন টেনিং নাই। তাই বলতেছি বৌমারে অক্ষণ মিশন হাসপাতালেই লইয়া যাও।*

সুদীপ : *এত রাইতে কেমতে নিমু। কোন গাড়িঘোড়া পাওয়া যাইব না।*

বাতাসী: *এই কতা কইলে অইব? রোগি বাঁচান লাগব। সিস্টার ডাক্তারের আতে পড়লে আর টিনশন থাকব না।*
[রবীন আসে রতন আর কাজলকে নিয়ে। সঙ্গে একটা বড় ঝুড়ি, রশি আর লম্বা বাঁশ]

রবীন : *রোগী নিবার ব্যবস্থা অইছে, অহন আর টেনশনের দরকার নাই। রতন, কাজল আমার সঙ্গে আয়। সুদীপ বৌদির কাপড় চোপর গুছাইয়া নে। [সকলে ঘরে যায়। সুদীপ কাপড় গুছিয়ে নেয়।]*

দৃশ্য : উঠান

[বড় ঝাকাতে কাঁথা-কম্বল দিয়ে কেয়াকে বসিয়ে বাইরে আনা হয়। বাতাসী তিন রোয়া রসুন আর একটা রোজারিমালা কেয়ার পাশে রাখে। একটা জবাফুল পানিতে ডুবিয়ে তিনবার কেয়ার গায়ে ছিটিয়ে দেয়। ঝাকার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তিনবার ফুঁ দিয়ে কী সব মন্ত্র বলে। সুদীপের হাতে হারিকেন, রবীনের কাঁধে ব্যাগ, টর্স। একটা কুকুর অনেকক্ষণ ধরে কুই কুই করে কাঁদতে থাকে যেন। বাতাসী ধমক দেয় এবং অভিসম্পাত করতে থাকে কুকুরকে। ওরা পথে নামতেই একটা কালো বিড়াল সামনে দিয়ে দৌড়ে একপাশ হতে অন্যপাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুদীপ আর্তনাদ করে থমকে দাঁড়ায়। রতন চারিদিকে থুতু ছিটায়। কাজল বুকে ফুঁ দেয় তিনবার। আবার এগিয়ে যেতেই কেয়ার আর্তনাদ। বিলের মাঝখান দিয়ে শিশির ভেঙ্গে এগিয়ে যায় ওরা।]

দৃশ্য : পথে

[এগিয়ে যেতেই দেখা যায় পথের ধারে একটা ছেলে আগুন পোহাচ্ছে। ওরা ভয় পেয়ে যায় ভূত ভেবে। কাছে যেতেই ছেলেটা সুর করে বলতে থাকে]

মিশুক : *"বর্গাবর্গি ত্রাণনাথ, আইজ যিশুর জন্মদিন। পিডা দেও, পিডা দেও। [সামনে একটা গামছার টুকরো ধরে বারবার বলতে থাকে।]*

কাজল : *রাইত দুপুরে পাগলা ভূতের পাল্লায় পড়লাম দেখছি।*

রতন : *ভূত না পাগলের পাল্লায় পড়লাম দেখছি। অই ছেমরা, এই বিল বাদরে তরে কেডা পিডা দিব? [আবারও একই শ্লেগান।*

কাজল : *অই বান্দর, তর নাম কী, বাড়ি কই?*

মিশুক : *নাম দিয়া কাম কি? পিডা পাইলেই চইলা যাই। আইজকা শিশু যিশুর জন্মদিন। তোমরা কেক খাইবা, আমারে পিডা দিলেই খুশী।*

রবীন : *আমগ বাড়িতে চল যাই, তরে পেট ভইরা কেক-পিডা খাওয়ামু।*

মিশুক : *সইত্য কইতাছ?*

রতন : *অবশ্যই। তয় তুই কই যাইতাছস?*

মিশুক : *[সুর করে] মুক্তিদাতার জন্ম আ বেথলেহেম গোশালে, পূঁজব আমি তারে নত শিরে খুঁজে পেলে তারে।*

কাজল : *আমরাও সেখানেই যাবো। আয় আমার সাথে। [বলেই বাঁশ কাঁধে তুলে দেয়। ওরা এগিয়ে যায়।]*

দৃশ্য : বটতলা

[বটতলার মোড় ঘুরতেই দেখে বিশালকায় এক লোক লাঠি হাতে দণ্ডায়মান। মুখ ঢাকা শীতের কাপড়ে। লোকটা বাজখাই গলায় কথা বলে।]

জলু : *আপনেরা কেডা, কই থাইকা আইছেন, কই যাইবেন, নাম ঠিকানা সব বলেন।*

সুদীপ : *আমরা-আমরা সেই- [এই ফাঁকে মিশুক সরে পড়ে।]*

জলু : *আমি আইনের লোক। আমার নাম মিয়া মুহম্মদ জালালুদ্দিন চাকলাদার। তবে সবাই আমারে জলু চহিদার বইলাই চিনে। আমগ বংশের সাত পুরুষ চাহিদার। আমগ যোসেফ মেম্বরের বাড়িতে গেছিলাম বড়দিনের দাওয়াত খাইতে।*

রবীন : *আমরা মাষ্টার পাড়া থাইকা আসছি। রোগি লইয়া হাসপাতালে যাইতাছি।*

জলু : *ইনপসিবল। সামনেই কালী মন্দিরের শ্মশান ঘাট। রাইত বিরাইতে পাইলেই ঘাড় মটকাইয়া দেয়। আমারেও দাবরানি দিছিল একবার, তয় কাবু করবার পারেনাই।*

রতন : *এইসব ভূত টুথ আমি ডরাই না। আমার লগে যেই জিনিস আছে, ভূতের বাপশুদ্ধ ডরে পলাইব।*

জলু : *ভূত-পেরেতের লগে বিশ্বাস নাই মিয়া। তবে সাহস লাগে। আমি দুইবার ডাকাইত ধইরা পুরুস্কার পাইছি। তাই চিয়ারমেন সাব বিমুগ্ধ হইয়া আমারে পরমোশন দিছে। [কেয়ার কাতর ধ্বনিতে চমকে ওঠে জলু।]*

জলু : *সব্বোনাশ! এত্ত রাইতে মাইয়া মানুষ লইয়া যাইবেন? আইজকা অমাবইশ্যা।*

রবীন : *ডেলিবারি রোগি, ভূত-টুথ থাকলেও যাইতেই হইব।*

জলু : *তাইলে যান। বাত্তিডা ওনার ডাইনে রাইখা আগে পিছে দুইজন থাইকেন। বাত্তি নিভলেই মহাসর্বনাশ। সোজা যাইবেন, আগে পিছে চাইলেই কপালে দুর্গতি। যান যান, আল্লাহ ভরসা।*
[সুদীপ বুকে ফুঁ দিয়ে এগিয়ে যায়। চকিদার সজোরে হাক ছাড়ে।]

দৃশ্য : **খালপাড়**

[মিশুক আগুন পোহাচ্ছে। সে পথে টর্স আর লাঠি হাতে আসছে ছোটন মাতব্বর। আগুন দেখে ভয়ে যিশুনাম জপতে থাকে।]

ছোটন : *"যিশু আমার পরমগুরু যিশু আমার সাথী, যিশু বিনা আমি অধম... [আগুন দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে] এই কেডা-কেডা? আরে কতা কয় না ক্যা? [মনে মনে] তবে কি ভূত...?*

মিশুক : *"মিশুক আমার নামটি বটে, বসতবাটি নাই, জগত জুইরা ঘুইরা ঘুইরা যিশুর গীত গাই।" [সুর করে নেচে নেচে গাইতে থাকে]*

ছোটন : *[মনে মনে] তাইলে এইডা ভূত না। ভূতে ত যিশুর নাম কইব না। [প্রকাশ্যে] অই পাগলা, এত্ত রাইতে এই চকের মইধ্যে আগুন পোহাইতাছস। তুই কী আসলেও পাগল না অন্য কিছু?*

মিশুক : *আমি ভাবের পাগল। আপনের অন্তর কালা, আপনে ভাবের মহিমা বুঝবেন কেমতে?*

ছোটন : *চেংড়া পোলায় আমার অন্তরের খবর জানে ক্যামতে? অই-তুই যাইবি কই?*

মিশুক : *'আমি দুয়ারে দুয়ারে গাহিয়া বেড়াই নবজনমের বাণী। হায়গো যিশুর জনমের বাণী।' [ছোটন এগিয়ে যায় তার সঙ্গে গাইতে গাইতে যায় মিশুক।]*

দৃশ্য : **ছোটনের বাড়ি**

ছোটন : *এইডা আমার বাড়ি। নাম রাখছি নাজারেথ ভবন। নামডা তর পছন্দ অইছে?*

মিশুক : *হ খুইব সুন্দর নাম। যিশুর বাড়িও নাজারেথ গ্রামে ছিল।*

ছোটন : *বৌমা- অ বৌমা, বাড়িতে মেহমান আইছে। কিছু খাওন দেও। [রিয়া উঠে মিশুকের পাগল চেহারা দেখে বিরক্ত হয়।]*

রিয়া : *বাবা! এটা আপনার মেহমান? বস্তির ভিখারিকে ধরে এনে...*

ছোটন : *বৌমা, পোলাডা গরীব অইলেও খারাপ না। খালি ধর্মের কতা কয়। রাস্তায় শীতের মইধ্যে আগুন পোহাইতে ছিল। পরইবা দিন, খালি মুহে খেদাইয়া দেওন ঠিক অইব না।*

মিশুক : *আমি না হয় চইলাই যাই। [গমনোদ্যত]*

রিয়া : *না খাইয়া যাওয়ার দরকার নাই। খাবার দিতাছি। [খাবার আনতে যায়]*

ছোটন : *তুই কলের পাড়ে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া আয়। খাওন দিতাছে। [রিয়া খাবার দেয় পিঠা, পোলাও, মাংস। মিশুক তৃপ্তি নিয়ে খায়।]*

মিশুক : *খাওন অনেক সাদ অইছে। পেট ভইরা খাইছি। আমার মায় এমুন খাওন রানত।*

ছোটন : *রাইত পরায় শেষ, শীতের মইধ্যে বাইরে গিয়া কাম নাই। সামান্য বিছনা দিলে এই খানেই কাইত অইয়া থাকব পোলাডা। এইডা আর্তজনের সেবা।*

দৃশ্য : **বারান্দা**

[বিছানা দিলে মিশুক শুয়ে পড়ে। রিয়া চলে যায়। ছোটন এক সেট নতুন জামা কাপড় এনে দেয়। মিশুক পড়ে খুশী হয়। পরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর রাতে গির্জার ঘন্টা বাজার শব্দে সে উঠে একটা কাগজে লিখে "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে খাদ্য দিয়েছে। নিরাশ্রয় ছিলাম আশ্রয় দিয়েছ। বস্ত্রহীন ছিলাম আমাকে বস্ত্র দিয়েছ....। মিশুক চলে যায়। ছোটন উঠে দেখে মিশুক নেই]

ছোটন : *বৌমা-বৌমা মেহমান নাই চইলা গেছে।*

রিয়া : *আমি তখনই বলেছিলাম নিশ্চয়ই চুরির মতলব নিয়ে এসেছিল। [নজরে পড়ে লেখা। সে পড়তে থাকে।] বাবা এই ছেলে কোন চোর-বাটপার নয়- এই ছেলে ---*

ছোটন : *এইডা ত যিশুর কথা। তবে কী যিশুই আমার বাড়িতে আশ্রয় চাইতে আসছিল?*

রিয়া : *বাবা, আমরা নিজেদের ধার্মিক বইলা অহংকার করি। অথচ বিশ্বাসের পরীক্ষায় আমরা যিশুকেই চিনতে পারি না।*

ছোটন : *আইজ বুঝলাম যিশু পাপীদেরও কত্ত ভালোবাসেন। [দু'জনে ছোট গোশালার সামনে প্রণত হয় পরম কৃতজ্ঞতায়।]*

দৃশ্য : মিশন হাসপাতাল

[ভোর রাত। হাসপাতালের দরজা বন্ধ। দারোয়ান ভিতরে ঝিমুচ্ছে। দরজায় কড়াঘাত করছে রতন।]

রতন : *দরজা খোলেন কাকু, রোগি লইয়া আইছি।*

ফালু : *[বিরক্ত হয়ে] কেডা-কেডা দরজা ধাক্কায়? রাইতে দরজা খোলা নিষেধ।*

রবীন : *অহন ভোর হয়ে গেছে কাকা। ডেলিভারি রোগি।*

ফালু : *[আংশিক খুলে] তোমগ কেমতে বুঝামো, রাইত্তে গেট খুললে আমার চাকরি যাইব। রোগি আনলে কী অইব, ডাক্তার নাই।*

সুদীপ : *ডাক্তার নাই!!*

ফালু : *সিস্টার ডাক্তার ঢাকায় গেছে, ফিরতে ফিরতে সেই মঙ্গলবারে।*

রবীন : *মঙ্গলবার! আর সময় নাষ্ট করন ঠিক অইব না, চল উপজেলা হাসপাতালে।*

[আবার চলতে থাকে। বড় রাস্তায় ভ্যান গাড়িতে করে উপজেলায় চলে যায়।]

দৃশ্য : উপজেলা হাসপাতাল

[ভিতরে চলছে অপারেশন। হাসপাতালের নার্স ফাতেমা রক্ত দেবে বলেছে। রবীনদের কারও রক্ত বি পজেটিভ না। বাইরে সবাই উৎকণ্ঠিত। সুদীপ পায়চারী করছে অস্থিরভাবে। এক সময় ভোরের আলোয় নবজাতকের কান্না শোনা যায়। ডাক্তার পূরবী বাইরে আসেন।]

পূরবী : *কনগ্রেচুলেশন সুদীপ বাবু। ইউ আর সো লাকি। যিশুর জন্মদিনে আপনার ছেলে হয়েছে।*

সুদীপ : *থ্যাংক ইউ ডাক্তার। আমার স্ত্রী-পুত্র ওরা.....*

পূরবী : *তারা দুজনেই সুস্থ আছে। শেষ পর্যন্ত ফাতেমার রক্ত দিতে সমস্যা হয়। পরে মিসেস কেয়ার ছোট ভাই রক্ত দিয়েছে।*

সুদীপ : *আমার স্ত্রীর ছোট ভাই! না-না ডাক্তার কেয়ার কোন ভাই নেই।*

পূরবী : *ভাই নেই! তবে যে বলল, সে ছোট ভাই, তার নাম মিশুক।*

সকলে : *মিশুক! [এ সময় ফাতেমা আসে হাতে একটা ফুলের তোড়া]*

ফাতেমা: *এই ফুলের তোড়াটা এই মাত্র কে যেন শিশুটির বিছানায় রেখে গেল।*

রবীন : *[হাতে নিয়ে] "শিশু যিশুর উপহার"। [পড়ে বিস্মিত হয়] শিশু যিশু....*

পূরবী : *ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড মিরাক্যাল। একদিকে রক্তদান আবার ফুলের উপহার। আপনার আসুন আমার সঙ্গে। [সকলে ভিতরে যায় নবজাতককে দেখতে।]*

দৃশ্য : হাসপাতাল কক্ষে

[কেয়ার পাশে নবজাতক শিশুটি ঘুমুচ্ছে। ওরা যেতেই নড়েচড়ে ওঠে। এ সময় আসে ছোটন ও রিয়া]

রবীন : *বাবা তোমরা, হাসপাতালে?*

ছোটন : *কেন, তোমার বন্ধু কী আমার কেউ নয়। ওর এত বড় বিপদে আমরা কী না এসে পারি?*

রিয়া : *আহা, বাবুটি কী সুন্দর করে ঘুমুচ্ছে।*

ছোটন : *বাবা রবীন, কাইল রাইতে ঘুমাইতে পারি নাই। এক আশ্চর্য ঘটনা ঘইটা গেল।*

রবীন : *কেন কি হয়েছে? কোন একসিডেন্ট?*

ছোটন : *একটা গরীব ছেলের সাথে পথে দেখা। শীতে আগুন পোইতেছিল। দেইখা মায়া লাগল। তাই বাড়িতে আইনা খাইতে দিলাম, শুইতেও দিলাম।*

রিয়া : *সকাল বেলা দেখি নাই। ভাবলাম চুরি করে পালিয়েছে। শেষে বিছানায় দেখি একটা কাগজে লিখে রেখেছে যিশুর সেই বাণী- "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে খেতে দিয়েছ। নিরাশ্রয় ছিলাম আমাকে আশ্রয় দিয়েছ। বস্ত্রহীন ছিলাম আমাকে বস্ত্র দিয়েছ।"*

রবীন : *ওর নাম মিশুক। সে হাসপাতালে কেয়ার জন্য রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দিয়েছে।*

রিয়া : *বাবার বিশ্বাস, স্বয়ং যিশুই আমাদের কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিলেন।*

রবীন : *আমারও তাই বিশ্বাস।*

রিয়া : *যিশু, পাপীদেরও ছেড়ে যান না কখনো। তিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকেন, যেন আমারও পরস্পরের সাথে মিলে মিশে একসাথে পথ চলি, গড়ে তুলি ভালোবাসার মিলন-সমাজ।*

রবীন : *বাবা, গতরাতে তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি করেছ।*

ভাষ্য : *এমনিভাবে প্রতি বছর বড়দিন আসে প্রত্যাশার নতুন আহ্বান নিয়ে। লক্ষকোটি শিশুযিশুর নবজন্ম হয় হৃদয়-গোশাল ঘরে। বর্তমান এই সংঘাতময় পৃথিবীতে কত হিংসা, লোভ, অনাচার সংঘাত, যুদ্ধ আর বিরামহীন রক্তপাত। নির্যাতিত অসহায় মানুষের কত কষ্ট, কান্নার কত হাহাকার। তাই শান্তির পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে আমরাও যেন একে অন্যের দুঃখ কষ্টের সহভাগি হই, সহযাত্রী হই। সকলে মিলেই যেন শান্তির পথে একসাথে পথ চলি, গড়ে তুলি প্রেম-শান্তি ও সম্প্রীতির মিলন-সমাজ॥*

আমেরিকানদের কুকুরপ্রীতি

খোকন কোড়ায়া

বিশ এপ্রিল, দুই হাজার বাইশ, সকাল এগারোটায় টার্কিশ এয়ারলাইন্সের বিমানটি নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। ইমিগ্রেশন সেরে এবং লাগেজ সংগ্রহ করে এয়ারপোর্ট থেকে বের হলাম সাড়ে বারোটায়। শুরুতেই ধাক্কা খেলাম একটা, প্রচণ্ড শীত, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। অথচ রওনা হওয়ার আগের রাতেও ঢাকায় এসি ছাড়তে হয়েছিলো। গাড়ীতে বসে আর একটু অবাক হলাম, গাড়ী চলে ডানদিক দিয়ে আর ড্রাইভারের সিট বাম পাশে, ঠিক আমাদের দেশের উল্টো। নিউইয়র্কের যে ছবি আমার মনের ক্যানভাসে এঁকে রেখেছি, তার সঙ্গে মিলছে না। ভেবেছিলাম নিউইয়র্ক সিটি আকাশচুম্বী দালানকোঠায় ভর্তি, সেরকম দেখলাম না। বরং রাস্তার দু'পাশে অনেক গাছ, ঢাকায় যা নেই। পরে অবশ্য সারি সারি হাইরাইজ বিল্ডিং দেখেছি ম্যানহাটনে। গাছের কথা বলছিলাম, শীতে পাতা ঝরে ন্যাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন কিছু কিছু গাছে পাতা গজাচ্ছে। আর একবার অবাক হলাম যখন দেখলাম কিছু কিছু গাছে পাতা গজানোর আগেই ফুল ফুটেছে। কুইন্সের ব্রায়ারউড-এ মেয়ের এপার্টমেন্টের টয়লেটে গিয়ে আবার ধাক্কা খেলাম, আমাদের দেশের সুইচ নিচের দিকে নামালে অন হয় আর এখানে অন হয় উপর দিকে উঠালে।

এবার লেখার শিরোনামে ফিরে আসি। আমার মেয়ের এপার্টমেন্টের অনতিদূরেই রয়েছে একটি মনোরম পার্ক। সেখানে দোলনা, স্লাইডসহ শিশুদের খেলাধুলার অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। আর পার্কের পাশেই রয়েছে একটি বিশাল মাঠ। মাঠটি তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ ফুটবল আর পলো খেলার জন্য, অন্য দুইভাগে রয়েছে দুইটি করে হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবল কোট। মেয়ে-জামাই নাতনীকে নিয়ে মাঝে মাঝে পার্কে যায়, আমিও যাই ওদের সঙ্গে। এরপর রাস্তাঘাট একটু চেনা হয়ে গেলে বিকেলবেলা আমি একা একাই পার্কে যেতে শুরু করি। কিছুক্ষণ মাঠে হাঁটি, তারপর একটি বেঞ্চে বসে উপভোগ করি বৃক্ষ পরিবেষ্টিত আমার অচেনা এক প্রকৃতি এবং আশপাশের দৃশ্যাবলী। আমেরিকানদের ঋতুরাজ সামার সমাগত, তাই সবার মনে এখন ফুরফুরে ভাব। মানুষ এখন বাহিরমুখো, রাস্তায়, পার্কে, মলে মানুষের সমাগম বাড়ছে। মানুষের সমাগম দেখে আমি অবাক হই না, অবাক হই কুকুরের সমাগম দেখে। ছেলে-বুড়ো, যুবতী, পৌঢ়া, বৃদ্ধা, অনেকের সঙ্গেই দেখি কুকুর। পার্কে বেড়াতে যাওয়া নারী-পুরুষের যে হাতে ধরে থাকার কথা তাদের শিশু সন্তানের হাত, সে হাতে থাকে কুকুর ছানার শেকল। অনেককে দেখা যায় দুটি-তিনটি কুকুর নিয়েও বেড়াতে বেরিয়েছে। পরে শুনলাম শুধু কুকুর নয়, বিড়ালও আমেরিকানদের প্রিয় পোষ্য। তবে বিড়াল নিয়ে খুব বেশি কেউ বাইরে বেরোয় না। কুকুর বিড়ালকে আমেরিকানরা সন্তানের মতই লালন পালন করে। তাদের নাওয়া, খাওয়া, পটি করানো সবই করে খুব যত্ন করে। পোষ্যদের পিছনে তারা খরচও করে অনেক। বড় বড় মল থেকে তাদের জন্য কিনতে হয় দামি দামি খাবার। অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে

ছবি: প্রবাসী এমিলি স্রং

নিতে হয়। অনেকে আবার নখ কাটার জন্য, লোম পরিষ্কার করার জন্যও পোষ্যদের বিশেষ সেলুনে নিয়ে যায়। আমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে শুনলাম তার কিশোরী কন্যা তিন হাজার ডলার দিয়ে একটি বিড়াল কিনেছে এবং বিশেষ সেলুন বা বিউটি পার্লারে গিয়ে সেই বিড়ালের সৌন্দর্য বর্ধন করতে খরচ হয়েছে আরো পাঁচশ' ডলার। সখের দাম এক লাখ নয়, সাড়ে তিন লাখ টাকা।

লেখাটি শেষ করবো এক বর্ষীয়ান দম্পতির গল্প দিয়ে। আমার এক বড় ভাই। তিনি যখন বাংলাদেশে ছিলেন আমার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। আমাকে অনেক স্নেহ করতেন তিনি। একদিন তার বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমারিকার বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারে দাওয়াত খেতে গেলে খাবার যাই হোক, কঠিন পানীয় থাকবেই। বড় ভাইও আমার সম্মানে সিভাস রিগ্যালের বোতল খুললেন। আমি পরিমিত পান করি, একটা পর্যায়ে গিয়ে থেমে গেলাম কিন্তু তার স্ত্রী বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও বড় ভাই চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, আজ আমাকে নিষেধ করো না খোকনকে এতদিন পরে পেয়েছি, আবার কবে না কবে দেখা হয় তার ঠিক আছে! পান করতে করতে বড় ভাই আমাকে শোনালেন তার জীবনের গল্প। আমেরিকায় আসার পর কি নিদারুণ কষ্ট, কি কঠিন সংগ্রাম তার করতে হয়েছে এই অচেনা দেশে টিকে থাকার জন্য সেই গল্প। শোনালেন এখন তিনি খুব সুখী মানুষ। নিউইয়র্কে দুটো বাড়ি আছে তার, একটি ভাড়া দিয়েছেন। সেই ভাড়ার টাকা এবং তারা দুজন রিটায়ার্ড করার পর যে বেনিফিট পান সেই টাকা মিলিয়ে যা হয় তার অর্ধেকও তাদের খরচ হয় না। ছেলে দু'টো এদেশে লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি করছে, ছেলেদের টাকায় তারা হাত দেন না কখনো। আমাদের গল্পের মাঝে একটু বাধ সাধছিলো একটি কুকুর ছানা আর একটি বিড়াল ছানা। বিড়াল ছানাটি বৌদির কোলে উঠে বসছিলো আর কুকুর ছানাটি বড় ভাইয়ের কোলে ওঠার চেষ্টা করছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটি কি আপনাদের নাতি নাতনিদের, কই তাদেরতো দেখছিনা!

বড় ভাই এবার একটু চড়া সুরে বললেন, নাতি নাতনি থাকলেতো দেখবে, আর নাতি নাতনি থাকবে কি করে ছেলেরাতো বিয়েই করেনি। বললাম, ও তাই! বড় ভাইয়ের নেশা তখন চরমে। বৌদি তাকে থামাতে ব্যর্থ হলেন, তিনি বলতে লাগলেন, বিয়ে করবে কেন, গার্লফ্রেন্ড আছে না, বড়টার স্প্যানিশ গার্লফ্রেন্ড আর ছোটটার ইন্ডিয়ান। বললাম, গার্লফ্রেন্ডদেরই বিয়ে কর, তাও করবে না। কিছুদিন আগে তোমার বৌদি আর আমি ছেলেদের নিয়ে বসেছিলাম। ওদের বললাম, দেখ বাবারা, তোমরা এদেশে বড় হয়েছো কিন্তু আমাদেরতো অর্ধেক জীবন কেটেছে বাংলাদেশে, বাঙালিত্ব আমরা বিসর্জন দিতে পারিনি। আমাদেরও সাধ হয় তোমরা বিয়ে করবে, ঘরে বউ আসবে, নাতী-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে আমরা সময় কাটাবো। তোমরা যাদের পছন্দ কর, তাদেরই বিয়ে কর। ছেলেরা কিছুই বললো না। পরদিন এই কুকুর বিড়ালের বাচ্চা দুটি কিনে এনে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, তোমাদের যখন সময় কাটে না, তাহলে এই দুটিকে লালন পালন কর। বড় ভাইয়ের গলাটা ধরে এলো, অনেক সুখে আছিরে ভাই, অনেক সুখে আছি বলে বাথরুমের দিকে গেলেন তিনি, হয়তো চোখের জল লুকাতে কারণ আমেরিকা কান্নার জায়গা নয়, আনন্দ করার জায়গা॥

তনিমাদের লড়াই

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

ছবি: রিপন টলেন্টিনো

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রবালের সাথে পারিবারিক পছন্দে বিয়ে হয় তনিমার। চমৎকার কাটছিলো ও'দের বিবাহিত জীবন। বছর ঘুরতেই ঝলমলে কন্যা সন্তানের আগমনে ছোট সংসারের সুখ হাজারো গুন বৃদ্ধি পায় । প্রবাল খুব খরুচে। বউ-মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, ভালো খাবার-দাবার আর দামী কাপড়-চোপড় পরানোর মধ্যে সে অনাবিল আনন্দ পায়। সংসার আর বাচ্চা সামাল দেয়ার ব্যস্ত সময় পার করে তনিমা।

প্রকৃতির খেয়াল বড় অদ্ভুত। সুযোগ পেলেই পাণ্ডিত্য জাহির করা মানবজাতি প্রকৃতির এ খেয়ালের কতটুকুই বা বুঝতে পারে। প্রকৃতির এ ধরণের এক আজব খেয়ালে হঠাৎ হার্ট-এ্যাটাকে মারা যায় প্রবাল। দশ বছরের সুখের সংসার আকস্মিক কালো ঝড়ে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়। শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে তনিমা ও তার সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করা হয়। তনিমার বাবার এমন কোন আর্থিক সামর্থ্য নেই যে তনিমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

অফিসে সকলের প্রিয়, সদালাপি প্রবালের সম্পত্তি ঘেটে দেখা গেল ব্যাংকে লাখ খানেক টাকা ছাড়া কিছুই নেই। এনজিও'র প্রজেক্টে চাকুরি করার কারণে মৃত্যুর পর আলাদা কোন বেনিফিটও নেই। অথৈ সাগরে পড়ে তনিমা। এ বিপদের সময় প্রবালের অফিস এগিয়ে আসলো। অফিস বলতে প্রবালের বস্ শৈবাল দা। তিনি সংস্থার প্রধান এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যদেরকে বলে সংস্থার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্পে মধ্যম পর্যায়ের একটি পদে তনিমার চাকুরির ব্যবস্থা করেন।

সময়ের পরিক্রমায় এক সময় ইঞ্জিনিয়ার প্রবালের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। অফিসে প্রবাল বৌদি পরিচয় থেকে বড় হয়ে উঠে সুন্দরী কর্মী তনিমা দিদি পরিচয়টি। একটু একটু করে সুন্দরী তনিমা দিদির নিকট ভিড়তে চেষ্টা করে সুযোগ সন্ধানী চরিত্রগুলো। আকারে ইঙ্গিতে থাকে নানা ধরণের কু-প্রস্তাব। অফিসের বড় থেকে ছোট অনেকেই বাজিয়ে দেখতে চায় তনিমাকে।

একমাত্র মেয়ে তনু ছাড়া আর কোন জগৎ নেই তনিমার। সে নতুন কোন জগৎ সৃষ্টিও করতে চায় না। সে কখনো হাসি-মুখে, কখনো-বা কৌশলে সকলকে এড়িয়ে চলা শিখে নেয়। কিন্তু প্রকল্পের সমন্বয়কারী লিমন ভাইকে এড়ানো তার জন্য দিন দিন কঠিন হয়ে উঠে। প্রকল্পের সমন্বয়কারীর নিকট কাজের জন্য যেতে হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে কর্মএলাকায়ও যেতে হয় মাঝে-মধ্যে। লিমন ভাই-এর চাহনী, রিক্সা বা অন্য কোন যান-বাহনে পাশাপাশি বসলে শরীরের ছোঁয়াতে সে পাপ দেখতে পায়। একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এসব সে সহ্য করে পাথরের কাঠিন্যে দিনের পর দিন।

লিমন-এর সাথে সংস্থার প্রধানসহ উর্ধ্বতন প্রায় সকলের খুবই ভাল সম্পর্ক্য। তনিমা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে লিমন ভাই-এর নারীর প্রতি দুর্বলতার কথা উর্ধ্বতনরাও জানেন। কেউ কিছু বলে না। সে নাকি দায়িত্ব-পালনে খুব দক্ষ, স্মার্ট। এমন কর্মী নাকি সংস্থার জন্য খুবই দরকার। তাছাড়া প্রতিটি পুরুষেরই নাকি একটু-আধটু এ ধরণের দোষ থাকেই। মেয়েদেরই উচিৎ নিজেকে সামলে চলা। এক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের বিষয়ে সংস্থার বিধিমালায় থাকা জিরো-টলারেন্স নীতিরও তোয়াক্কা করা যাবে না। এমনই একটি নারী বিদ্বেষী আবহ তৈরি হয়ে আছে নারী-বান্ধব-এর নকল মোড়কে মোড়ানো এ নারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটিতে।

উর্ধ্বতনদের সাথে ভাল সম্পর্ক লিমনকে বেপোরোয়া করে তোলে। অধ্বঃস্তনদের সে সর্বদা বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে তটস্ত রাখে। সে চায় অধ্বঃস্তনরা সব সময় তাকে তোয়াজ করুক। তার বৈধ-অবৈধ নির্দেশ মেনে চলুক। এক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা বিচার্য্য নয়। তনিমা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু নারীর হৃদয় জয় করার পরিবর্তে শরীর দখল করার বাতিকগ্রস্ত পুরুষের টার্গেট ভিন্ন। সে সারাক্ষণ সুযোগ খুঁজতে থাকে তার লক্ষ্যিত নারীর সামনে নিজের কুৎসিৎ স্বরূপ প্রকাশের। আবার সমাজে নিজের একটা সুশীল সুশীল ভাবমূর্তি ধরে রাখারও আপ্রাণ চেষ্টা করে সে।

এক শরতের বিকালে লিমন-এর স্বরূপ প্রকাশের পাল্লায় পড়ে তনিমা। দাতা সংস্থার দেশী-বিদেশী প্রতিনিধি আসবেন প্রকল্প পরিদর্শনে। একটি জেলা শহরের পাশের উপজেলায় প্রকল্পের কাজ চলছে। তনিমা প্রকল্প অফিসের পাশেই একটি ভাড়া বাসায় থাকে। একজন মেয়ে কলিগ্ এর সাথে শেয়ার করে। তনিমার মেয়ে তনু একটি আবাসিক স্কুলে থেকে পড়াশুনা করে।

রবিবার পরিদর্শন শুরু। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে দুই দিন পূর্বেই প্রধান কার্যালয় থেকে লিমন এসে উঠেন প্রকল্প কার্যালয়ের পাশের একটি গেস্ট হাউসে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত তনিমারা অফিসে কাজ করে। শনিবার লিমন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তনিমাদের ছুটি। অফিস থেকে বাসায় ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর তনিমা সবেমাত্র প্রকল্প কার্যক্রম প্রেজেন্টেশনের ড্রাফ্ট-এ চোখ বুলাচ্ছে। ঠিক তখনই লিমন-এর ফোন।

- তনিমা, সাড়ে চারটা নাগাদ আপনি কি একটু গেস্ট হাউসে আসতে পারবেন? পরিদর্শনের ব্যাপারে আপনাকে আরও কিছু টিপ্‌স দেয়ার ছিলো। ঘন্টা খানেকের মত লাগবে। শনিবার আমি আবার অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবো। সময় দেয়া যাবে না। আমি হিসাব-রক্ষণ কর্মকর্তা সুমনকেও আসতে বলেছি।

বিকালে তনিমার তেমন কোন কাজ নেই। এ পরিদর্শনের সাফল্যের উপর ও'দের প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে। তদুপরি এ প্রকল্পের আওতায় ও'রা কাজও করেছে অনেক ভাল। তাই পরিদর্শনের গুরুত্ব অনেক। তনিমা আগ-পিছ না ভেবে রাজি হয়ে যায়।

গেস্ট-হাউসের অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে লিমনকে খবর দেয় তনিমা। লিমন তাকে ৫২০ নাম্বার রুমে যেতে বলে। তনিমা উস্-খুস্ করে। ভাবে, সুমনও তো আসবে। সুমন ভদ্র ছেলে। ও সাথে থাকলে কোন সমস্যা হবে না নিশ্চয়!

৫২০ নাম্বার রুমে লিমন একা। দরোজা খোলা। টিভিতে ইংরেজী মুভি দেখছে। কিন্তু সুমন কোথায়? প্রকল্প সমন্বয়কারী ডেকেছেন-আসবে তো অবশ্যই- ভাবতে ভাবতে তনিমা রুমে ডুকে। তনিমাকে দেখে লিমন-এর

চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে যায়। এ ঝিলিকে যে পাপ মেশানো-তনিমা বেশ বুঝতে পারে। মেয়েদের একটি তৃতীয় নয়ন আছে। এ নয়নে মেয়েরা অনেক কিছু আগাম দেখতে পায়।

- খুশীর ঝিলিক চোখে-মুখে মাখানো অবস্থায় লিমন বলে- আরে তনিমা, আসেন, আসেন, বসুন। আপনার সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে। দরোজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি।

লিমন দরোজা ভেজায় না। পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে এসে তনিমার মুখোমুখি বসে। লিমন প্রজেক্ট বা পরিদর্শন বিষয়ক কোন আলোচনায় না গিয়ে সরাসরি নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে আলাপ শুরু করে। অতি দ্রুত এ আলোচনা নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কে পৌঁছায়। লিমন বলেই চলে- দেখেন তনিমা, মেয়ে আর ছেলে যদি সম্মত থাকে তাহলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন পাপ নেই। তাছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর আপনি একা আছেন, অনেক বছর হলো। প্রকৃতিরও তো একাট নিয়ম আছে। দিনের পর দিন প্রকৃতির নিয়মের বরখেলাপ করা ঠিক নয়। আমি আপনাকে প্রকৃতির ছায়া দিতে চাই, তনিমা। আপনার জীবনকে সুন্দর করে দিতে চাই। ঝলমলে করে দিতে চাই। লিমন তনিমার পাশে এসে গা ঘেসে বসে। কাঁধে হাত রাখে। লিমন-এর মুখ থেকে বের হওয়া তাজা মদের গন্ধে তনিমার গা গুলিয়ে উঠে।

লিমন-এর গা ঘেসে বসা এবং অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় তনিমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। রাগ আর ভয়ে ও'র শরীর কাঁপতে থাকে। তনিমা বেশ বুঝতে পারে, ও' এক হাড়-বজ্জাত বদ্‌মাশ-এর পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। মাথা গরম করলে সিন্-ক্রিয়েট হওয়ার সম্ভাবনা। সিন-ক্রিয়েট হলে তনিমারই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

তনিমা লিমন-এর হাত আলতো করে কাঁধ থেকে নামাতে নামাতে বলে- ভাই, আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সন্ধ্যায় আমার ঘন্টা খানেকের কাজ আছে। আপনি আজ রাতের জন্য একটি রুম বুকিং দিয়ে রাখেন। কাজ শেষ হলে আমি আপনার সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করবো। আপনি গাড়ি পাঠালে আমি গেস্ট হাউসে চলে আসবো। তখন মন দিয়ে আপনার কথা শোনা যাবে।

সাব্বাস তনিমা। ব্রিলিয়ান্ট চিন্তা। আপনার মতো ব্রিলিয়ান্টরাই তো আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেতৃত্ব দেবে। আপনাকে অনেক উচুঁতে উঠতে হবে। আমি আছি আপনার পাশে। যা কিছু করা লাগে আমি করবো আপনার জন্য।

আনন্দে উড়তে থাকা লিমন নিজে উঠে দরোজা খুলে দেয়। তনিমা বাহির থেকে দরোজা টান দিয়ে লাগিয়ে দেয়। দরোজা লাগানোর শব্দটা একটু জোরেই হয়ে গেল বোধ হয়। অন্য সময় হলে লিমনের কানে শব্দটা বিশ্রিভাবে লাগতো। কিন্তু লিমন-তো এখন উড়ছে। তার উপর তো পাপ ভর করেছে। তাই এসব শব্দে-টব্দে এখন তার কিছু যায়-আসে না।

তনিমার চেহারার যা অবস্থা তাতে মনে হয় যেন এই মাত্র সে যমের ঘর থেকে লড়াই করে এসেছে। তনিমা বুদ্ধিমতী মেয়ে সে বুঝতে পারে চেহারার এ অবস্থা নিয়ে কারও সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। সে পাশের বাথ-রুমে গিয়ে চোখে মুখে ভাল করে পানি দিয়ে বেরিয়ে আসে।

নীচে নেমে প্রথমে সে সুমনকে ফোন দেয়- সুমন ভাই, আপনি কোথায়?

- আমি তো আমার বন্ধুর বাসায় আছি, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। কেন, জরুরী কোন প্রয়োজন?

- না সুমন ভাই, তেমন জরুরী কিছু না। আগামীকাল সকালে অফিসে দেখা হবে বলে তনিমা ফোন রেখে দেয়।

তনিমার বুঝতে বাকি থাকে না সুমনের গেস্ট-হাউসে থাকার বিষয়টি পুরো বানোয়াট। লিমন-এর উপর রাগ আর ঘৃণায় তনিমার গা শির্ শির্ করতে থাকে।

তনিমা সোজা বাসায় চলে আসে। ঘামে ও'র সারা শরীর ভিজে আছে। সচরাচর ও' বিকালে গোসল করে না। কিন্তু আজ করতে হবে। একটি পাপী-লম্পটের ছোঁয়া খানিকটা হলেও ও'র শরীরে লেগে আছে। তা ধুয়ে-মুছে ফেলতে হবে।

গোসল শেষে ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে দেখে ও'র কলিগ সোনিয়া বসে টিভি দেখছে। তনিমার অবেলায় গোসল করা দেখে সোনিয়া বেশ অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে,

- কি তনিমাদি, অবেলায় গোসল করলে যে?

- গরমে ঘেমে খুব খারাপ লাগছিলো, তাই গোসল করলাম। এখন বেশ লাগছে।

তনিমা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। বিষয়টি সোনিয়ার নজর এড়ায় না।

- তনিমাদি তোমার কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। তোমার চোখ-মুখ, গলার স্বর কিন্তু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। সোনিয়া রিমোট চেপে টিভি বন্ধ করে দেয়।

তনিমা সিদ্ধান্ত নেয় ঘটনাটি সোনিয়ার সাথে শেয়ার করবে। অন্যান্য কলিগদের সাথেও শেয়ার করবে। চুপ থাকবে না। এসব বিষয়ে নারীদের নীরবতা লম্পটদের সাহস বৃদ্ধি করে। ও' প্রতিবাদ করবে। কেউ এগিয়ে না এলে একাই প্রতিবাদ করবে। তনিমা ভাবে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পে কাজ করতে এসে নির্যাতনের শিকার হয়ে আমরা নিজেরাই যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে ফিল্ডে গিয়ে নারীদের এতদিন কি শেখালাম? প্রতিবাদ না করলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই তো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। আর আমাদের সংস্থার প্রধানও তো একজন নারী। নারী উন্নয়ন নেত্রী হিসাবে দেশে-বিদেশে উনার অনেক সুনাম। নিশ্চয়ই এ ধরণের নির্যাতনকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না! তনিমা সহজে বিশ্বাস হারাতে চায় না।

তনিমা সোনিয়ার মুখোমুখি বসে গেস্ট-হাউসে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি বিস্তারিত বলে। সোনিয়া মাথা নীচু করে শোনে। তনিমার বলা শেষ হলে সোনিয়া মাথা উচুঁ করে। তনিমা অবাক হয়ে দেখে, সোনিয়ার চোখে জল। সোনিয়া কাঁদছে। তনিমা অবাক হয়-

- আরে সোনিয়া, কাঁদছো কেন? আমাদের তো ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। শক্ত হতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কেউ না আসলে আমি একা প্রতিবাদ করবো। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন না..... 'যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'...

- না দিদি, আমি মোটেও ভেঙ্গে পড়ছি না। আমি কাঁদছি আমার ভীতু স্বভাবের জন্য। এ লম্পটটা আমার পেছনে লেগেছে অনেক আগে থেকেই। ও'র কারণে আমার অনেক ক্ষতিও হয়ে গেছে। আমি কাউকে বলিনি। তুমি তো জানো দিদি, আমার বৃদ্ধ মা-বাবা আর ভাইয়ের সকল খরচ আমার চাকুরির উপর নির্ভরশীল। এ চাকুরিটা হারালে সকলকে নিয়ে পথে বসতে হবে। তাই এতদিন মুখ বুঝে সব সহ্য করেছি। আর করবো না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। তুমি আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেছো দিদি। ও' একটা ভদ্রবেশী হিংস্র জানোয়ার, দিদি। ও'কে ছাড়া যাবে না।

তনিমা ও সোনিয়া খোঁজ নিয়ে আরও দু'জনকে পায় যারা এ লম্পট লিমন-এর লালসার শিকার হয়েছে। লিমন-এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ নিয়ে সংস্থার সহকারী নির্বাহী পরিচালক শৈবাল-এর সাথে দেখা করে ও'রা। শৈবাল দাদা ধৈর্য নিয়ে সমস্ত ঘটনা শোনেন।

- তোমরা আমাকে খানিকটা সময় দাও, আমি বিষয়টি দেখবো। তবে মনে রেখো কোন নারী নির্যাতনকারী আমার নিকট প্রশ্রয় পাবে না।

শৈবাল তার নিজস্ব চ্যানেলে খোঁজ-খবর নিয়ে ঘটনার সত্যতা পায়। তিনি তনিমাদের ডেকে নির্বাহী পরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিলের পরামর্শ দেন।

ও'রা নির্বাহী পরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করে।

অভিযোগ দাখিলের বিষয়টি লিমনের কানে যায়। সে চেষ্টা চালাতে থাকে বিষয়টি ধামা-চাপা দেয়ার জন্য। তার সবচেয়ে শক্তির জায়গা হয়ে উঠে নির্বাহী পরিচালকের ভাইপো কাজল। লিমন খোঁজ নিয়ে জানতে পারে কাজলেরও কিছু নারী সংক্রান্ত কেলেংকারী আছে। লিমন এ কেলেংকারীগুলো পুঁজি করে। সে কাজলকে বোঝায়-

- আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আপনিও কিন্তু রেহাই পাবেন না, কাজলদা। এরপরই কিন্তু আসবে আপনার পালা। শৈবাল হারামীর বাচ্চা কিন্তু আপনাকেও ছাড়বে না। আপনি আপনার ফুপুকে বুঝিয়ে দেখেন এ যাত্রায় সহকারী নির্বাহী পরিচালক, শৈবালকেই কতল করে দেয়া যায় কিনা। ও-কে সাইজ করা গেলে এ সব মেয়ে কোথায় হারিয়ে যাবে...। আরও একটা কথা মনে রাখবেন, সহকারী নির্বাহী পরিচালককে সাইজ করতে পারলে সংস্থার সকল ক্ষমতা কিন্তু আপনার হাতে.... দাদা।

লিমনের কথা কাজলের নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। সে ফুপু এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্য তার বড় ভাই এবং বড় ভাইয়ের বন্ধুকে তাদের পক্ষে আনতে সক্ষম হয়। তারা ঘন ঘন মিটিং করে। সিদ্ধান্ত হয়, সহকারী নির্বাহী পরিচালক শৈবাল এবং অভিযোগকারী তনিমাসহ চারজনকে সংস্থায় রাখা যাবে না। যেভাবেই হোক ওদেরকে বের করে দিতে হবে। তবে এমনভাবে ঘটনাটি ঘটাতে হবে, যেন সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক জানে শৈবাল খুবই নীতিবান লোক। তিনি শৈবালের নৈতিকতায় আঘাত করে রাগিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন-

-দেখেন শৈবাল, প্রতিটি পুরুষের মধ্যেই-তো এ ধরণের বদ্-স্বভাব আছে। আর লিমন তো খুব দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। আমি বিভিন্ন সময়ে কথা বলে দেখেছি- খুবই ভাল ছেলে ও'। আর মেয়েগুলো সংস্থায় নতুন এসেছে। বিয়ে-সাদি হলে চলে যাবে। অল্প কয়েকদিনের জন্য চাকুরী করতে এসে সমস্যা বাঁধিয়ে দিলো। আমি শুনেছি মেয়েগুলোও তেমন একটা ভাল না। আর কি যেন মেয়েটির নাম, তনিমা, ও কেন গেস্ট হাউসে গেল? আপনি বরং ওদের সাথে বসে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলেন। আমি জানি ও'রা আপনার কথা শুনবে।

- শৈবাল বলে, লিমন এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করা তো প্রয়োজন। স্বচ্ছ তদন্ত করলেই তো সব কিছু জানা যাবে। সংস্থার বিধিতেও তো এ ধরণের অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত করার কথা বলা আছে। আবার নারী নির্যাতনের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স-এর কথাও তো বলা আছে বিধিতে...

-নির্বাহী পরিচালক শৈবালের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেন- আরে বিধিতো আমরাই বানাই, নাকি? দরকার হলে বিধি পাল্টে দেবো। আর তদন্ত করলে বিষয়টি জানাজানি হবে.. সংস্থার বদনাম হবে...আমার বদনাম হবে। এ বিষয়টি নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করা যাবে না শৈবাল। আমি যা বলেছি তাই করেন-তাহলে আপনারও ভাল আমাদেরও ভাল।

শৈবালের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এ কি শুনছে সে। প্রথিতঃযশা নারী নেত্রীর মুখে এ-কি কথা? এরাই তো সভা-সেমিনারে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বড় বড় বুলি আওড়ায়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায় থেকে পুরস্কারও গ্রহণ করে থাকে। অথচ নিজের সংস্থায় নারী নির্যাতন বিষয়ে আনিত অভিযোগের কোন রকম তদন্ত না করে মেয়েগুলোর সাথে কথা না বলে রায় দিয়ে দিচ্ছেন? একটি পক্ষ নিয়ে নিচ্ছেন?

নির্বাহী পরিচালক, তার ভাইপো এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শৈবালের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এ ধরণের অসুস্থ মানসিকতার ভন্ডদের সাথে দিনের পর দিন কাজ করাও তো সম্ভব না। শৈবাল চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে নির্যাতিতা মেয়েগুলোর জন্য ও শেষ লড়াইটা লড়ে যেতে চায়।

নির্বাহী পরিচালক এবং তার তোষামদকারী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের একটা বড় অংশ অপরাধী লিমনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। উপায়ন্তর না দেখে শৈবাল নির্যাতনের শিকার মেয়েগুলোকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্পের দাতা সংস্থার নিকট নির্যাতনের বিষয় এবং তাদের প্রতি সংস্থার আচরণ বিস্তারিত উপস্থাপনের ব্যবস্থা করে দেয়। কারণ শৈবাল মনে করে- নারী নির্যাতন কোন একটি সংগঠনের বিষয় নয়। কেউ ইচ্ছা করলে ক্ষমতার জোরে একে ধামা-চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। দাতা সংস্থার প্রতিনিধি ঘটনা শুনে খুবই অবাক হন। তারা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তদন্ত সম্পন্ন করে ঘটনার সত্যতা পান এবং লিমন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। বিষয়টি নিয়ে কাল-ক্ষেপন, গড়িমসি এবং লিমনকে বাঁচানোর বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ চলতে থাকে। চরম অসন্তুষ্ট দাতা সংস্থা ফান্ড বন্ধ করে দেয়ার কথা বলে। এবার নির্বাহী পরিচালক ও তার চেলা-চামুন্ডাদের টনক নড়ে। এরা লিমনকে অন্য কারণ দেখিয়ে অব্যাহতি প্রদান করে।

শৈবালের সাথে তনিমারাও এধরণের ভণ্ডদের আখড়ায় পরিণত হওয়া সংস্থায় কাজ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হঠাৎ চাকুরী হারালে তাদের এবং পরিবারের কি হবে এমন একটি পাহাড় সমান অনিশ্চয়তায় সময় অতিবাহিত করছিলো তনিমারা। এ কষ্টকর সময়ে ও'রা জানতে পারে একটি সংস্থা নারী দিবস উপলক্ষে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ নির্বাহী পরিচালককে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ও'রা ভাবে এ ভণ্ড নির্বাহী পরিচালকের বিরদ্ধে কিছু করার যোগ্যতা তো ও'দের নেই। তবে এ পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থাটিকে সত্য ঘটনা জানালে কিছু হয় কিনা দেখা যেতে পারে। তনিমারা ও'দের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিস্তারিত সংস্থাটিকে লিখিতভাবে জানায়। সংস্থাটি বিষয়গুলো আমলে নিয়ে নির্বাহী পরিচালককে পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালককে বিষয়টি জানিয়ে দেয়।

নির্বাহী পরিচালক কম্পিউটার চালাতে জানে না। ই-মেইল চেক করার তো প্রশ্নই আসে না। তার ই-মেইল চেক করে যখন যে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারে সেই কর্মকর্তা। নিয়মিত চেক করা হয় না। যথারীতি ই-মেইল চেক না করেই নির্বাহী পরিচালক এবং তার পছন্দের ব্যক্তিবর্গ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়। তারা দেখতে পায় মঞ্চে টানানো ব্যানারে পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ও ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ব্যানারে নির্বাহী পরিচালকের নাম ও ছবি নেই। কেউ তাদেরকে অভ্যর্থনাও জানাচ্ছে না। পুরস্কারের ব্যাপারে যে মেয়েটি নির্বাহী পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করেছিলো তাকেও দেখা যাচ্ছে না। নির্বাহী পরিচালক এবং তার সাথে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসা সদস্যরা বিচলিত বোধ করে।

নির্বাহী পরিচালক মোবাইলে কথা বলার জন্য হলরুম থেকে বের হওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায়। তিনি দেখতে পান তনিমারা হাসিমুখে হলরুমে প্রবেশ করছে। সাথে পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থার সেই মেয়েটিও আছে যে তার সাথে পুরস্কারের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করেছিল। মেয়েটি তাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যায়।

দিনের পর দিন মিথ্যার লেবাস পরে মানুষকে বোকা বানিয়ে ফায়দা লুটে নেয়ার দক্ষ কারিগর নির্বাহী পরিচালক, তামান্না রহমান ঘটনা ঠিকই বুঝতে পারেন। তিনি ভাবেন, তাহলে কি তার ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে যাচ্ছে? তার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। মাইকে সকলকে হলরুমে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ শোনে নিজেদের মধ্যে আলাপেরত অতিথিগণ হলরুমের প্রবেশ করতে থাকে। তামান্না রহমান হাঁটতে থাকেন গেইটের দিকে। কিন্তু গেইট কোথায়? তিনি গেইট দেখতে পাচ্ছেন না। মূলত তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তার চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। এক পৃথিবী অন্ধকার ঘিরে ধরে তাকে॥

অন্য এক দুনিয়া

ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ

ছবি: হিয়া গমেজ

ঘড়িতে তখন রাত তিনটা বাজে। সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চালের উপর টুপটাপ শিশিরের জল পরছে। সারারাত ঘেউ ঘেউ ডেকে শেষ প্রহরে এসে কুকুরটাও ক্লান্ত হয়ে বারান্দার কোণে শুয়ে আছে, তার চোখেও ঘুম। ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে বাজলেও গভীর ঘুমের রাজ্যে কেউ যখন হাঁটে তখন তা শোনা যায়না। করবী দেখল এমন একটা জায়গায় সে হাঁটছে যেখানে সব অচেনা মানুষ। সবাই প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণায় কাতরাচ্ছে এক ফোঁটা জল নেই। করবী নিজেও খুব তৃষ্ণার্ত। এদিক ওদিক খুঁজছে এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল দূরে একটা আলো ঝলমলে প্রাসাদ, তার চারপাশে আর কিছু নেই। প্রচণ্ড ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে ছুটে গেল যদি কিছু মেলে। কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল প্রাসাদের চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া, কোনভাবেই যেন ভেতরে ঢোকা যাবে না। উঁকিঝুঁকি মারতেই বড় কাঁচের জানালা দিয়ে খাবার ঘরটি দেখতে পেলাম। টেবিলে বাহারি খাবার ফলমূল, মিষ্টি, দই। তার জিভে জল এসে গেল। সে দেখল একটা মেয়ে খুব সুন্দর পোশাক পড়ে খাবার টেবিলের কাছে এলো। তার চারপাশে দাস-দাসীও আছে। মেয়েটা জানালার কাছে আসতেই করবী চিনতে পারল তাকে। এতো সেই মেয়ে যে কিনা আমার বাসায় বুয়ার কাজ করে। করবী খুশিতে হাত উঁচু করে তাকে ডাকলো। মর্জিনা, এই মর্জিনা এদিকে তাকা, এই যে আমি তোর দিদি। কিরে চিনতে পারছিস না?

মেয়েটা কাঁচের জানলার ভেতরে কিছুই শুনতে পেলনা। করবী আরো চিৎকার করে বলল আমি তোর দিদিমনি, দরজাটা খোল একটু জলখাবার দে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি আর গরমে শরীরটাও পুড়ে যাচ্ছে। করবী গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক জোরে জোরে মর্জিনা মর্জিনা বলে ডাকছে। একটা সময় করবীর বর শুনতে পেল করবী ঘুমের মধ্যে খুব গোঙরাচ্ছে। তখন তাকে জাগানোর চেষ্টা করল। কোনোভাবেই ঘুমটা ভাঙছে না দেখে তার পিঠে ঝাঁকুনি দিতেই করবী উঠে বসলো। সে খুব ঘামছিল। করবীর বর জিজ্ঞেস করল -

কি হয়েছে, স্বপ্ন দেখেছ?

করবী চোখ মেলে চারপাশটা দেখে তার মনে হলো আসলেই তো সে স্বপ্ন দেখেছে। আঁচল টেনে মুখ মুছল। কি হয়েছে কি স্বপ্ন দেখেছো বারবার মর্জিনার নাম ধরে গোঙরাচ্ছিলে কেন?

দেবেশ প্রশ্নগুলো করতে করতে তাকে জল ঢেলে দিল। করবী এমনভাবে জল পান করল, যেন কত দিন ধরে জলপান করেনি সে। করবী তখনো ঘামছিল। দেবেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো এখনো বেশ রাত আছে শুয়ে পড় সকালেই না হয় শুনবো। দেবেশ লাইট বন্ধ করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। করবী ভাবতে লাগল এমন স্বপ্ন দেখার মানে কি? এতো যেমন-তেমন স্বপ্ন ছিল না?

সবকিছু অন্যরকম, যেন মৃত্যুর ওপারে। সবাই হাহাকার করছিল এক ফোঁটা জলের জন্য। সে নিজেও কাতরাচ্ছিল অথচ তার বাড়ির কাজের লোকের কাছে এমন করে মিনতি করলো শুধু এক ফোঁটা জলের জন্য। স্বপ্নটার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে তার আর ঘুম হল না। সূর্য উঠতেই সে জানালা খুলে বারান্দায় দাঁড়াল। বারবার চোখের সামনে ওই দৃশ্যটাই ভাসতে লাগল। সাতটা বাজতেই মর্জিনা দরজায় নক করল। দরজা খুলে করবী যেন নতুন করে মর্জিনাকে দেখতে লাগল। মর্জিনা তার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। রোজ মর্জিনাকে ধমকাতো একটু দেরি হলেই। আজও মর্জিনা একটু দেরি করে আসলেও করবী কোন কথাই বলল না। মর্জিনা ওর ছোট মেয়েটাকেও সাথে করে নিয়ে আসে তা নিয়েও করবী খ্যাচ খ্যাচ করে। একদিন মেয়েটার হাত ফসকে একটা কাপ ভেঙেছে তা নিয়ে করবী খুব চেঁচামেচি করেছে। মর্জিনার তো কোন উপায় নেই কষ্ট পেলেও পেটের দায়ে সবই হজম করে নিতে হয়। মর্জিনার পাশে বসে একটা পুরনো মাটির পুতুল নিয়ে খেলছিল শাহানা। করবী আজ ছোট মেয়েটাকে কাছে ডাকল। শাহানা এদিকে আয় তো। মর্জিনা মেয়েকে ইশারা দিল কাছে যেতে। মেয়েটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে

গেল। করবী বললো আরে ভয় পাচ্ছিস কেন?

তোকে কিছু দেব কাছে আয়। ফ্রিজ থেকে একটা আপেল বের করে শাহানার হাতে দিলো। শাহানা খুশিতে সেটা হাতে নিয়েই তার মায়ের কাছে গেল। মর্জিনা অবাক হয়ে গেল। আজ একদম অন্যরকম ব্যবহার যা আগে কখনো সে দেখেনি। করবীর বর চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে কিন্তু দৃষ্টি করবীর দিকে। কাজে যাবার তাড়া ছিল বিধায় তৎক্ষণাৎ কারণটা জানতে চাইলোনা। করবীকে কিছুটা উদাস মনে হচ্ছে সেটাও তার বর লক্ষ্য করেছে। রোজকার মতো গলার স্বরটাও হাইপার না তবে বিষয়টা স্বাভাবিক নয়। করবী বরের জন্য আর ছোট মেয়ে রোদেলার টিফিন প্যাক করে দিল। রোদেলা শাহানার হাতে আপেল দেখে মা কে প্রশ্ন করল ও মা দেখেছ শাহানা আপেল নিয়েছে।

স্কুলে যাও দেরি হয়ে যাচ্ছে। মেয়ের প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তাদের দুজনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আজ এমন একটা দিন শুরু হয়েছে সবার মনেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। মর্জিনা সকালে কাজে আসে দুপুরে চলে যায়। আবার দুপুর থেকে সন্ধা পর্যন্ত আরো দুটো ঘরে কাজ করে। একেকটা বাড়িতে কাজ হিসেবে তার টাকা নির্ধারিত। যেহেতু মর্জিনার স্বামী অসুস্থ তেমন কাজকর্ম করতে পারেনা তাই ছোট মেয়েকে সাথে করেই কাজে বের হয়। করবী রান্নাঘরে সবজি কেটে গ্যাস চালু করে কড়াইটা বসিয়ে দিল। রান্না ঘরের এক কোণে বসে শাহানা আপন-মনে খেলে রোজ। মর্জিনা ব্যস্ত থাকে তার কাজে। করবী রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে শাহানার সাথে। মর্জিনা মেয়ের জন্য মাঝে মাঝেই কথা শোনে, নালিশ হজম করে। তবে শাহানা খুব শান্ত মেয়ে। করবী চুলার আঁচ কমিয়ে বেডরুমে গেল। মেয়ের পড়ার টেবিল থেকে একটা পেন্সিল, রাবার আর খাতা এনে শাহানাকে দিল। আজ থেকে লেখা শিখবি। আমি দেখি তুই রোজ খেলনা দিয়ে খেলিস। লেখাপড়া না শিখে বোকা হয়ে থাকতে চাস?

মর্জিনা কথাটা শুনে জবাব দিল, ওরে ইস্কুলে দিতে চাই দিদি কিন্তু মাস গেলে হাতে আর কিছু থাকে না। ওর বাপের ওষুধেই অর্ধেক টাকা চলে যায়। করবী জানতে চাইলো মাসিক বেতন কত দিতে হয় স্কুলে?

মর্জিনা জবাব দিলো আমার ভাইস্তীর কাছে শুনছি বেতন খুব বেশি না কিন্তু বইখাতা এসবেই অনেক খরচ। তবে খুব বেশি না হলেও আমার পক্ষে তো মুশকিল। করবী মর্জিনাকে আশ্বস্ত করে বললো ওর বইখাতা যা লাগে আমি কিনে দেবো তুই ওকে স্কুলে ভর্তি করা। নিজে তো পড়ালেখা করতে পারিস নি অন্তত মেয়েটাকে পড়া। মর্জিনা মেয়েকে বলল মারে খালামনির পা ধরে সালাম কর। শাহানা তাই দৌঁড়ে গিয়ে করবীর পা ধরে সালাম করল। আরে কি করছিস সালাম করতে হবে না। এখন থেকে তুই স্কুলে যাবি মনে থাকবে?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মর্জিনা কাজ শেষ করতে ব্যস্ত হল। করবীও রান্না শেষ করে থালা-বাসন সিংকে রেখে ফ্যান ছেড়ে চেয়ারে বসলো। করবীর পায়ে মাঝে মাঝে ব্যথা হয় অনেক লম্বা সময় সে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারেনা। মর্জিনা সব কাজ শেষ করে যখন বের হবে করবী তার পার্স থেকে টাকা বের করে মর্জিনার হাতে গুঁজে দিল। তার কাঁধে হাত রেখে বলল মেয়েকে খাতা পেন্সিল কিনে দিস আর ওকে অবশ্যই স্কুলে ভর্তি করে দিস।

মর্জিনা খুশিতে কেঁদেই ফেলল। এতদিন ধরে এ ঘরে সে কাজ করছে কিন্তু করবীকে এমন দরদী স্বভাবে এ প্রথম অনুভব করলো। এক রাতে এমন কি ঘটলো যে সকালে পুরো মানুষটাই বদলে গেল। মর্জিনা চলে গেল ঠিকই তবে তার অবাক নয়নে একটা প্রশ্ন থেকে গেল। করবী হাতের বাকি কাজগুলো সেরে স্নান করে তার বরের জন্য আর মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। টিভিতে গানের সো ছেড়ে সোফাতে পা মেলে বসলো। সারাদিন পর ফোনে চোখ বুলাতেই তার চোখে পড়ল তার বান্ধবীর বরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর ছবি পোস্ট করেছে। মাত্র দু'বছর তাদের বিবাহিত জীবন ছিলো। একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে সব তছনছ করে দিল। তাদের ঘরে ফুটফুটে কন্যা, সে কিছু বোঝার আগেই বাবার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল। করবীর আজ মনে হতে লাগলো জীবনটা সত্যিই কতো ছোট অথচ কেউ কেউ কতো গভীর বেদনা, গভীর একাকিত্ব নিয়ে বাঁচে। করবীর ভাষা নেই তার সহপাঠীর মনকে শান্ত করার। আদৌও আছে কি কোন সান্ত্বনা?

হঠাৎ ধুপ ধাপ পায়ের শব্দ শুনতেই করবী বুঝতে পারল বাবা মেয়ে স্কুল থেকে ফিরছে। করবী ফোনটা রেখে এগিয়ে বারান্দায় গেল। দেবেশের হাত ধরে রোদেলা হেলতে দুলতে ঘরে প্রবেশ করল। রোজকার মতন করবী দেবেশকে স্নানে যেতে বলল। স্কুল ব্যাগটা রেখে মেয়ে টিভির রিমোট হাতে নিতেই করবী বলে উঠলো আগে স্নান, খাওয়া, হোমওয়ার্ক তারপর টিভি। মেয়ে মুখটা গোমড়া করে রিমোট রেখে তার রুমে চলে গেল। দেবেশ সোফায় বসে করবীর দিকে তাকাল। চোখে তাকে ইশারা করলো পাশে বসতে। তারপর করবীর হাতটা নিজের হাতের তালুতে রেখে জানতে চাইল কাল রাতে কি স্বপ্ন দেখেছ?

বারবার তুমি মর্জিনার নাম ধরে গোঙরাচ্ছিলে। করবী বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আমি যে কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম পুরো দিন সেটাই ভাবছি। এবার বল কি দেখলে?

দেখলাম আমি যেন একটা অন্যরকম দুনিয়াতে গেছি, সেখানে আমার চারপাশে সব অদ্ভুত মানুষ। তাদের চেহারা কারো কারো খুব বিকৃত, সবাই হাহাকার করছে। চারপাশে আগুন সবাই তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত। আমারও প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছি। আমি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে দেখলাম একটা প্রাসাদ। আমি ছুটে গেলাম মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয়ই ওখানে একটু জল তো মিলবেই। কাছে যেতেই দেখি তার চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া কোনভাবেই ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ। আমি প্রাসাদের চারপাশে হাঁটতেই একটা বড় কাঁচের জানালা চোখে পড়লো। ভালো করে ভেতরে নজর দিতেই দেখলাম মর্জিনা একদম রাজকন্যার মত দামি পোশাকে খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। ওর চারপাশে অনেক দাস-দাসী। টেবিলে এতো এতো খাবার আর পানীয়। আমি মর্জিনাকে এত ডাকছি, মিনতি করছি আমাকে একটু জল দে, আমি তোর দিদি। কিন্তু মর্জিনা কিছুতেই শুনছে না। আমি চিৎকার করেই যাচ্ছি, অবশেষে তুমি ঘুমটা ভাঙালে । দেবেশ তখন বললো তুমি প্রচণ্ড ঘামছিলে। আমি তোমাকে কখনো এমন করে জল পান করতে দেখিনি। মনে হলো কতদিন জল খাওনি তুমি। পুরো দুই গ্লাস জল পান করেছ তুমি।

সত্যিই আমি অন্য এক দুনিয়াতে ছিলাম। আহারে কেমন সে পিপাসা, কি যে কষ্ট। দেবেশ তখন করবীকে বললো, স্বপ্ন তো স্বপ্নই অবশ্য এর ব্যাখ্যা আমারও জানা নেই। তবে আমরা সুন্দর জীবন-যাপন করবো, মৃত্যুর ওপারে তার অবশ্যই ভালো উপহার গ্রহণের যোগ্যতা থাকবে। এনিয়ে আলাদা করে ভাবার দরকার নেই। ভালো কিছু করো, ভালো কিছু ভাবো, সব কিছু ভালোই হবে॥

কাঁচাগোল্লা

সাগর কোড়াইয়া

নাটোরের কাঁচাগোল্লা খেয়ে দুইবার দুইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। প্রথম অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ নয় তবে দ্বিতীয়টি স্বর্গীয়। কাঁচাগোল্লা সমন্ধে বরাবরই ভুল ধারণা ছিলো। হরেক রকম মিষ্টি খাওয়া হয়েছে কিন্তু কাঁচাগোল্লা দেখতে ও খেতে কেমন তা জানা ছিলো না। কাঁচাগোল্লার একটি কল্পচিত্র এঁকে রেখেছিলাম। প্রথমবারের কল্পচিত্রের সাথে কাঁচাগোল্লার আকারের হেরফের হয়েছে। আর দ্বিতীয়বারের কল্পচিত্রে স্বাদের পূর্ণতা ছিলো।

রাজশাহী ভার্সিটিতে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার সুবাদে প্রতি সপ্তাহে রাজশাহীতে আসতে হতো। দুইবছর আসা যাওয়া করতে হয়েছে একটানা। প্রতি সপ্তাহে এলাকার জুনিয়র ভাইদের সাথে হোস্টেলে থাকতাম। ওদের আবদার ছিলো আসার সময় যেন নাটোরের কাঁচাগোল্লা নিয়ে আসি।

অনেকদিন যাবৎ আমিও ভাবছি রাজশাহীর কালাই রুটি খাওয়া হয়েছে কিন্তু নাটোরের কাঁচাগোল্লা তো খাওয়া হয়নি। সুযোগ বুঝে একদিন কাঁচাগোল্লার স্বাদ নিতে হবে।

সেবার রাজশাহীতে যাওয়ার পথে বাস নাটোরের বাইপাসে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড গরম! ঘেঁমে একাকার হবার অবস্থা। বাসের ফ্যানগুলো থেকে উদগ্রীত বাতাসগুলোও আগুনের হলকা ছাড়ছে। একদম ভালো লাগছিলো না। বাস কখন ছাড়বে সে অপেক্ষায় আছি। এরই ফাঁকে কানে ভেসে এলো কাঁচাগোল্লা বিক্রেতার অদ্ভূত সুরে হাঁকডাক, এই নাটোরের কাঁচাগোল্লা, একবার যে খেয়েছেন তো মজা পেয়েছেন, আবার খেতে মন চাইবে।

বাসের জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বিক্রেতাকে খুঁজতে থাকি। কোথাও খুঁজে পাই না। সব বুঝি ভিণ্ডুল হলো ভেবে কাঁচাগোল্লা পাবার আশা ত্যাগ করি। ভাবতে থাকি, জুনিয়রদের কাঁচাগোল্লা খাওয়ানো এবারও হলো না।

ছবি: রিপন টলেন্টিনো

চোখটা মাত্র লেগে এসেছে। কানের কাছে বিকট চিৎকারে কাঁচাঘুম ভেঙ্গে যায়। কাঁচাগোল্লা বিক্রেতার চিৎকার! বাসের ভিতরে বিক্রেতা কাঁচাগোল্লার গুণাগুণ প্রকাশ করছে। আশেপাশে তাকালাম। কাউকে কাঁচাগোল্লা কিনতে দেখলাম না। বিক্রেতা বুঝি আমার মনোভাব বুঝতে পারে। আরো জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, না খাইলেই পস্তাবেন, নিয়ে যান ভাই নাটোরের বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা।

দাম জিজ্ঞাসা করতেই বিক্রেতা বললো, কাঁচাগোল্লা একদম কাঁচাবাদামের দর। কয় প্যাকেট নিবেন স্যার?

দুই প্যাকেট বলতেই বিক্রেতা বললো, তিনশত টাকা প্যাকেট দিয়েন।

অবশেষে আড়াইশত টাকা প্যাকেট দরদামে দুই প্যাকেট কিনলাম। বাসে বসা মানুষগুলো আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। মনের মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করে। ভাবতে থাকি, বাসে বসা মানুষগুলো অবাক হয়েছে নিশ্চয়। হিংসা করছে হয়তোবা! শুনেছি নাটোরের কাঁচাগোল্লার বেশ দাম। অর্থাভাবে অনেকেই কাঁচাগোল্লা কিনতে পারে না।

ইতোমধ্যে বাস চলতে শুরু করে। আমার আনন্দ যেন একটু বেশিই। অবশেষে জুনিয়র ভাইদের কাঁচাগোল্লা খাওয়াতে পারবো। সিনিয়র হয়ে ওদের আবদার পূরণ করতে পারাটা আনন্দের বরাবরই। প্যাকেট দুটো এমন জায়গায় রাখলাম যেন বাসের সবাই দেখতে পায়। রাজশাহী পর্যন্ত আমার চোখে আর ঘুম নেই।

হোস্টেলে ফিরে দেখি সবাই বাহিরে গিয়েছে। বিকাল থেকে আর তর সইছে না। কখন কাঁচাগোল্লার প্যাকেট খুলবো! সন্ধ্যার মধ্যে সবার ফিরে আসে। সবাইকে ডেকে জড়ো করি। আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে প্যাকেট খোলার আশায়। সবাই প্রতিক্ষায় আছে প্যাকেটে কি দেখবার জন্য।

অবশেষে বললাম, তোমাদের জন্য নাটোরের কাঁচাগোল্লা নিয়ে এসেছি।

সবার চোখমুখের দিকে তাকাই। সবার মুখ আনন্দে চিকচিক করছে। অধীর আগ্রহে সবাই প্যাকেটের চারিদিকে বসা। কারো হাতে চামচ আবার কারো হাতে

বাটি। মনে হচ্ছে প্যাকেট খোলার সাথে সাথে সব কাঁচাগোল্লা নিঃশেষ করে দিবে।

প্যাকেট খোলা হলো। সবার চোখ প্যাকেটের দিকে। সবার চোখ ছানাবড়া! এ আবার কিসের গোল্লা! গোল্লা হবে গোলাকৃতির। কিন্তু হায়! এতো দেখি ছাড়া ছাড়া।

পাশ থেকে একজন বললো, শুনেছি কাঁচাগোল্লা নাকি গোলাকৃতির হয় না।

সবাই হাঁফ ছেঁড়ে বাঁচলো। একবাক্যে বলে ওঠলো, তাই তো বলি কাঁচাগোল্লা কেন গোলাকার না।

সবার হাতে প্রসাদ দেবার মতো কাঁচাগোল্লা দিলাম। শেষে মনে হলো আমার ভাগ্যে বুঝি কমই পড়েছে। সবাই মুখে পুরে কাঁচাগোল্লার স্বাদ আহরণে ব্যস্ত। ইতোমধ্যে অনেকে গলাঃধকরণ করে ফেলেছে। সবার তৃপ্তির ঢেকুর তোলার চিত্র দেখে নিজের তৃপ্তি মেটানোর আশায় সবার দিকে তাকাই। আমার হাতে তখনো কাঁচাগোল্লা। মুখে পুরবো ভাবছি। দেখি সবার চোখ বড় বড়। চোখগুলো বুঝি ছিঁটকে বেরিয়ে আসবে। মনে হলো সবাই অমৃত খাচ্ছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কাঁচাগোল্লার স্তুতিবাক্য!

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো একজন জুনিয়র ভাই। বরাবরই ও কম কথা বলা ছেলে। হঠাৎ বলে ওঠলো, কি ছাইপাশ, বাজে জিনিস রে বাবা! এটা কোন মিষ্টি হলো নাকি। টক আর দুর্গন্ধে ভরা!

জুনিয়রের কথা শেষ হবার আগেই একে একে সবাই ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দে ওয়াশ রুমের দিকে দৌড়ে গেল। অনেকে পৌছানোর পূর্বেই ঘরের মেঝেতে মুখের বাকি অংশটুকু ফেলে দিয়ে বাঁচে।

কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। ওদের অবস্থা দেখে কাঁচাগোল্লা খাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। মনে হয়েছিলো কাঁচাগোল্লা বিক্রেতাকে হাতের নাগালে পেলে কাঁচাগোল্লা বানিয়ে ছাড়বো।

পরদিন থেকে চারজনের লুজ মোশন। টয়লেটে শুধু যাওয়া আর আসা।

এরপর প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনদিন কাঁচাগোল্লা খাবো না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়নি। অবশেষে কাঁচাগোল্লা খেতে হলো। কাঁচাগোল্লার পাশাপাশি আমার জীবনে এক নতুন বাঁক এসেছে সেদিনই।

ততদিনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স শেষ। চাকুরীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। বেসরকারি মিডিয়ায় চাকুরী পেয়ে যাই। চাকুরীর সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে যেতে হয় প্রায়ই। সে বার দিনাজপুর প্রেসক্লাবের কর্মশালা শেষ করে দুপুরের ট্রেনে নাটোরের উদ্দেশ্যে ফিরছি। নাটোরে নেমে সোজা প্রেসক্লাবে চলে যাবো। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

ট্রেনেই পরিচয় চন্দ্রিমার সাথে। পাশের সিটে বসেছে। প্রথম দেখাতেই জীবনানন্দ দাশের নাটোরের বনলতা সেন বলে মনে হলো চন্দ্রিমাকে। দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ে। নাটোর শহরেই বাড়ি। কথার ফাঁকে নাটোরের কাঁচাগোল্লার বিষয় উঠলো।

কাঁচাগোল্লা সমন্ধে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা শুনে চন্দ্রিমা বললো, আপনি তো ঠকবেনই! বাস থেকে কাঁচাগোল্লা কিনতে গেলেন কেন! নাটোরে এলে জয়কালী বাড়ি মন্দিরের গেট থেকে কাঁচাগোল্লা কিনতে হয়। চলুন, আগে নাটোরে পৌছানো যাক; তারপর আপনাকে না হয় কাঁচাগোল্লা খাওয়াবো।

এরপর পুরোটা রাস্তা গল্প করে কখন যে নাটোর পৌছে গেলাম বুঝতেই পারিনি। নাটোর স্টেশন থেকে বের হয়ে চন্দ্রিমার সাথে মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসলাম। চন্দ্রিমাই কাঁচাগোল্লা অর্ডার করলো। দু'বাটিতে কাঁচাগোল্লা দেওয়া হলো। পূর্বাভিজ্ঞতার কারণে ভয়ে ছিলাম। চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে আছি। ইচ্ছা ওই আগে মুখে তুলুক। তারপর না হয় অবস্থা বুঝে আমি মুখে পুরবো। আমার মনের কথা চন্দ্রিমা বুঝতে পারলো। মুচ্‌কি হেসে চা চামচে কাঁচাগোল্লা তুলে মুখে পুরে নিলো।

চন্দ্রিমার খাওয়া দেখছি। ওর খাওয়ার মধ্যে শৈল্পিক একটা ছোঁয়া আছে। কেন যেন চন্দ্রিমাকে মনে হলো বড় আপন। কাঁচাগোল্লা আর ভালবাসার নিষিদ্ধ ফলটা একসাথে খেতে ইচ্ছা হলো সেদিন।

নির্ভয়ে কাঁচাগোল্লা চামচে পুরে মুখে দিলাম। এক মিনিটের জন্য আমার চোখ বন্ধ। কাঁচাগোল্লার স্বাদটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। মনে হলো পৃথিবীর সব মিষ্টির নির্যাস দিয়ে কাঁচাগোল্লা তৈরী করা হয়েছে। মুহূর্তেই কাঁচাগোল্লাকে ভালবেসে ফেললাম। চোখ খুলে দেখি চন্দ্রিমা নিমগ্নে তাকিয়ে আছে।

সেদিন চন্দ্রিমার সাথে অনেক কথা হলো। বিদায় নিয়ে সোজা প্রেসক্লাবে চলে গেলাম। এরপর চন্দ্রিমার সাথে তিন বছর আর কোন যোগাযোগ নেই।

যোগাযোগ হয়েছে বিয়ের ঠিক তিনমাস আগে। একদিন নাটোরে এসে চন্দ্রিমাকে মোবাইলে কল দিই। চন্দ্রিমা নাটোরেই ছিলো। দেখা করি। সেদিন আমিই প্রথম চন্দ্রিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। শুনে চন্দ্রিমা বলেছিলো, এতদিন কোথায় ছিলেন? উত্তরে আমি বলি, নাটোরের বনলতা সেন!

বিয়ের আগে দু'জনেরই পূর্বশর্ত ছিলো বিয়ের দিন কাঁচাগোল্লা খাইয়ে অতিথিদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে। কাঁচাগোল্লা দিয়েই আপ্যায়ন করা হয়েছিলে বিয়েতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন যাদের সাথে একই হোস্টেলে থাকতাম এলাকার সেই জুনিয়র ভাইদেরও নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। ওরা সবাই এসেছিলো বিয়েতে।

চন্দ্রিমাদের বাড়ির পাশেই মিষ্টির দোকান। কাঁচাগোল্লাও পাওয়া যায়। বিয়ের পরদিন দোকানের মালিক বিরাট অঙ্কের বিল নিয়ে হাজির।

বিল দেখে আমি তো হতবাক!

মালিককে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল, জুনিয়র ভাই পরিচয় দিয়ে একদল যুবক বাকিতে দোকান থেকে কাঁচাগোল্লা খেয়েছে। আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না ওরা কারা।

চন্দ্রিমা আমাকে ডেকে বললো, কি আর করবে; এবার ঠেলা সামলাও!